নীতি-রত্নমালা।

উনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের প্রথম ও
প্রধান প্রবর্ত্তক ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়

প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ-চরণাশ্রিত
সেবক
শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন কবিভূষণ
কর্ত্তৃক
কাশী-যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩৩০

সুনীতি শিক্ষার ধ্বনি গগন ভেদিল।
সুবোধ বালক যত জাগিয়া উঠিল।
ভারতের জয়, আর্য্য যশোগুণ গায়
জাতীয় গৌরবচিহ্ন রাখিবারে চায়।
গাও সবে মিলি ভাই ভারত কুমার,
পরি গলে ভারতের নীতি-রত্নহার॥

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিদ্যোদয় প্রেস
১৭ নং রাধানাথ বোস্ লেন, (গোয়াবাগান)
কলিকাতা।

যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি

এই পুস্তকের স্বত্ব ও উপস্বত্ব

কাশী-যোগাশ্রমে আবির্ভূতা

৺মা যোগেশ্বরীর

ভোগ, রাগ ও সেবার্থ

দীনাতিদীন শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ-কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

ও

সমর্পিত হইল।

শকাব্দা ১৮১৫

১৮৯৩

৩য় সংস্করণ

প্রকাশকের নিবেদন।

নীতি-রত্নমালা পুনঃ প্রকাশিত হইল। এই তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা ও আভাস রূপে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহোদয়ের লিখিত "নীতিশিক্ষা" বিষয়ক প্রবন্ধটী "ধর্ম্ম-প্রচারক" ৬ষ্ঠ ভাগ, ৫ম সংখ্যা হইতে এবং "ধর্ম্ম" প্রবন্ধের কিয়দংশ "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" হইতে "ধর্ম্ম-শিক্ষা" নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। অধিকন্তু "আমাদের ধর্ম্মভাবের অবনতির কারণ কি?" বিষয়ে তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণও এই পুস্তকের পুষ্টিবর্দ্ধনার্থ অবতরণিকা ও আভাসের উপসংহাররূপে প্রদত্ত হইল। পরিব্রাজক মহোদয়ের যে সমস্ত উপদেশ "শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত" নামে ধর্ম্ম-প্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারও কয়েকটী এবারে সদুপদেশ, সঙ্কেত ও চারু-চিন্তাবলীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গ, বিহার ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশস্থ বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণের চরিত্র-গঠন ও ধর্ম্মনীতি-জ্ঞান-শিক্ষার্থ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক বহুস্থানে যে সমস্ত "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যক্ষ শুভফল এক্ষণে হিন্দু-সমাজে পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই এইরূপ এক একটী সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্র ও ছাত্রীগণের জীবনে সংযম ও সদাচার শিক্ষা এবং স্বধর্ম্মভাব বিকাশের বিশেষ সম্ভাবনা। এই শুভোদ্দেশ্য সাধনের সাহায্যার্থ "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার" নিয়মাবলী ও কার্য্যপ্রণালী পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। বালক বালিকা উভয়েরই পাঠোপযোগী করিবার জন্য পুস্তকের কয়েকটী স্থানে বিভিন্ন পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিব্রাজক মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত স্থনীতি-সঞ্চারিণী সভাসমূহের সভ্যগণের স্থশিক্ষাবিধানার্থ তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "স্থনীতি" নাম্নী পাক্ষিক পত্রিকায় যে সমস্ত সদুপদেশ, সঙ্কেত, কবিতা ও প্রবন্ধাদি তিনি স্বয়ং লিখিতেন তাহারই অধিকাংশ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার আর কয়েকটী রচনার সহিত একত্র করিয়া "নীতি-রত্নমালা" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এবারও "স্থনীতি" পত্রিকা হইতে "বিবাহ" শীর্ষক প্রবন্ধটী পরিশিষ্টমধ্যে উদ্ধৃত এবং তৎসহ পরিব্রাজক মহোদয়ের একখানি পত্রও প্রকাশিত হইল। "পরিব্রাজকের সঙ্গীত" হইতে কয়েকটী স্থনীতি ও স্বধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতও এই সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে বালক বা বালিকাদিগের চরিত্রবল ও স্বধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হইলেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে আমার সোদরপ্রতিম পরমবন্ধু কবিরাজ শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, বি,এ, মহাশয় অতীব প্রীতি ও যত্নের সহিত এই সংস্করণের প্রুফ এবং পূর্ব্ব সংস্করণে যে সমুদয় মুদ্রাঙ্কন দোষ ছিল তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। মা তাঁহার মঙ্গল করুন্।

এই পুস্তকের স্বত্বাধিকার যোগাশ্রমে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীশ্রী ৺অন্নপূর্ণা যোগেশ্বরী মাতার শ্রীচরণে অর্পিত হইয়াছে এবং ইহার আয় তাঁহারই সেবা ও পূজায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। কৃপাময়ী মা বালক বালিকাগণের কোমল হৃদয়ে সদ্ভাব বিকাশ করুন।

১লা ফাল্গুন, ১৩২২। — শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ চরণাশ্রিত
সেবক শ্রীক্ষেত্রনাথ।

৪র্থ সংস্করণ

প্রকাশকের নিবেদন।

নীতি-রত্নমালা ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব সংস্করণে যে সমুদয় মুদ্রাঙ্কন-দোষ ছিল তাহা বিশেষ ভাবে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। অধিকন্তু এই সংস্করণে ভক্তি ও ভক্ত হইতে শিশু ভক্ত ধনা ও ইন্দুরেখার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। আশা করি ইহা পাঠে বালকবালিকাদিগের হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস ও ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি হইবে। শ্রীশ্রী৺যোগেশ্বরী অন্নপূর্ণা মাতার সেবার্থে এই পুস্তকের আয় ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাঁহার কৃপায় সুকোমলমতি বালকবালিকাবৃন্দের হৃদয়ে ইহা পাঠে সদ্ভাব বিকাশ হইতেছে দেখিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

১৫ই আশ্বিন
১৩৩০।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ চরণাশ্রিত
সেবক শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন।

সূচপত্র।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

কুমার পরিব্রাজক

শ্রীমৎপরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী।

"যিনি ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি দুষ্টজনের ষড়্যন্ত্রে লাঞ্ছিত হইয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবায় ও স্বধর্ম্মের উদ্দীপনায় কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে শিথিলপ্রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সুমধুর বক্তৃতায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আস্বাদনে দেশবাসিগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন,"* তাঁহার আবির্ভাব-দিন ভারত-সন্তানগণের সুনীতিশিক্ষা ও স্বধর্ম্মভাব বৃদ্ধির জন্য যে শুভ সুযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা স্বদেশ-হিতৈষী সকলেই স্বীকার করিবেন। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় মহাপুরুষগণের চরিত্রাভিনয়, সুলভ গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণতন্ত্রের প্রচার, ধর্ম্ম-নীতিশিক্ষা ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি প্রধানতঃ যাঁহার জীবনব্যাপী ধর্ম্মান্দোলনের সুফল, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ১২৫৬ সনের হিন্দোলদ্বাদশীর (ঝুলন

* ঢাকাপ্রকাশ।

দ্বাদশীর) দিনে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর পূর্ব্বনাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাঁহার পিতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ কলিকাতায় তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গার মহিমায়, গায়ত্রীর উপাসনায় ও হরিনামের মাহাত্ম্যে অটল বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মাতৃকুলে শক্তি-উপাসনার—বৎসরে কয়েকবার কালী পূজার—অনুষ্ঠান হইত। তাঁহার মাতা ভবসুন্দরী দেবী ভক্তি-প্রিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতামাতার ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি উভয়েরই অধিকারী হইয়াছিলেন। অতি শৈশবকালে শ্রীকৃষ্ণ এক দিন তাঁহার পিতৃকর্ত্তৃক ঔষধার্থ আনীত সর্পবিষ পান করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। শিশু ঈশ্বরেচ্ছায় ও পিতার চেষ্টায় জীবন লাভ করিলে আত্মীয় স্বজনগণের ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ জীবনে কোনও বিশেষ সাধুকার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে পিতা পুত্রকে ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রতি-বাসী গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি পূজা, আহ্নিক গোসেবা ও ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানে সময় অতিবাহিত করিতেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাটীর বিল্বমূলে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে প্রত্যহই একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভক্তিপূত নারায়ণপূজা দর্শন ও স্তবপাঠ শ্রবণ করিতেন। শিক্ষকের সাধুজীবন অলক্ষ্যে শিশুর ভাবি-জীবনের ভিত্তি গঠন করিতে লাগিল। গুপ্তপাড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দেবের সেবাকার্য্য তখন দণ্ডি-সন্ন্যাসিগণই পরিচালনা করিতেন, এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পূজা করিবার অধিকার অবিবাহিত ব্রাহ্মণেরই ছিল। সুতরাং দেবদর্শনকালে ধর্ম্মসাধনের সহায়স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য পড়িত। বিশেষতঃ তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে সাধু-সেবা ও সদাব্রতের সুব্যবস্থা থাকায় অনেক সময়েই গুপ্তপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর অতি নিকটেই দেশকালিকাতলার বিশাল বটবৃক্ষের তলে সাধু মহাত্মারা অবস্থান করিতেন, এইজন্য পল্লীর স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সকলেরই সাধুদর্শনের বিশেষ সুযোগ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মজন্মের পুণ্যফলে বাল্যকাল হইতেই সাধুদর্শন ও সাধুগণের সদালাপ শ্রবণে ভাবিজীবন গঠনের সামগ্রী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

পাঠশালায় কয়েক বৎসর বাঙ্গালা শিক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে মুগ্ধবোধব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, পরে গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হইলেন। অনন্তর তিনি কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিয়া কালনা মিশনস্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশনরীগণের হিন্দুবালকগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল উৎসাহ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পিতা পুত্রকে বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। এই সময়ে ম্যালেরিয়া-জ্বরের অতি প্রকোপে শ্রীকৃষ্ণের শরীর নিতান্ত রুগ্ন এবং তাঁহার পাঠাভ্যাসের বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় তাঁহার মন অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বীয় ভাগিনেয় পণ্ডিত শ্রীচরণ রায়

কবিরাজ (মহারাণী স্বর্ণময়ীর চিকিৎসক) মহাশয়ের নিকট বহরম-পুরে পাঠাইয়া দেন। তথায় ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। বহরমপুরে পাঠকালেই তাঁহার ভাবিজীবনের অস্ফুট আভাস দেখা দিতেছিল, এবং আত্ম-জীবনের মনুষ্যোচিত উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। উপনয়নের পর হইতে তাঁহার সদাচার ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ বিশেষ-রূপে লোকের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার কিশোর বয়সের রচিত সঙ্গীতগুলিই পরে "সঙ্গীতমঞ্জরী" নামে প্রকাশিত হয়। উহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার তাৎকালিক সরল বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকে ১৮ বৎসর বয়সেই বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার দুইটী কনিষ্ঠ সহোদরের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পিতা কলিকাতার চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া গুপ্তপাড়ায় বাস করিতেছিলেন, সুতরাং বৃহৎ পরিবারে হঠাৎ অর্থাভাব উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর তখনও বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানি-তেন, সুতরাং ভাবিলেন, যদি এই সময়ে পিতামাতার সেবায় জীবন সফল করিতে না পারিলাম তবে আর বিদ্যার্জ্জনে ফল কি? তিনি শীঘ্রই স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পিতার অজ্ঞাতসারে ও শিক্ষক-গণের স্নেহানুরাগ উপেক্ষা করিয়া জামালপুর রেলওয়ে অফিসে

চাকরী স্বীকার করিলেন। এই সময় হইতেই তিনি নিজ জীবনের লক্ষ্যসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অফিসে নিয়মিত কার্য্যের পর অন্য সময় বৃথা ব্যয় না করিয়া তিনি উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি পুরাণাদির অধ্যয়নে এবং ইংরাজী দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ অধ্যবসায়-গুণেই আপনাকে সুশিক্ষিত ও উন্নতচরিত্র করিয়াছিলেন, ইহাতে ভগবানের কৃপা ও পিতা মাতার শুভাশীর্ব্বাদই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল।

জামালপুরে কার্য্য করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গেরেই বাস করিতেন। মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীঘাটে অনেক সময়েই সাধু-মহাত্মাদের সমাগম হইত। একদা শ্রীকৃষ্ণ সৌভাগ্যক্রমে এইস্থানে পরমহংস-মণ্ডলীসহ সমাগত পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমদ্দয়াল-দাসস্বামিমহোদয়ের শুভদর্শন লাভ করেন। বাবা দয়ালদাসস্বামী শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শ্রদ্ধা ও সদ্‌গুণে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভাগী-রথীতীরে কষ্টহারিণীঘাটে দীক্ষা দান করিলেন, এবং স্নেহবশতঃ বালক শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "বৎস যদি অরূপের রূপ দেখিতে চাও, তবে দৃষ্টিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে অভ্যাস কর"। সদ্‌গুরু-দত্ত সাধন-পথ ও তাঁহার নিজ সাধু চেষ্টা একত্র হইয়া মণিকাঞ্চন-যোগ হইল। ক্রমে সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধ প্রভাবে তাঁহার দিব্য বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। এইরূপে বিনা উপদেশে শাস্ত্রীয় গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি ও ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতার হৃদয়াকর্ষিণী শক্তিও স্বতঃ জাগিয়া উঠিল। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের চৈতন্যসঞ্চার করিবার

নিমিত্ত সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার কণ্ঠে সমাসীনা হইলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার এই ধর্ম্মভাব ও মহদুদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট সাধক বোধে সংসারী হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করা উচিত মনে করিলেন না। এই সময় হইতেই সকলে তাঁহাকে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন।

কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন অবকাশকালে তীর্থাদিভ্রমণ ও ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন দ্বারা দেশের অবস্থা অনেকটা অবগত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই স্বধর্ম্মের অবনতি ও বিধর্ম্মের বিস্তৃতি দেখিয়া তিনি নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন। এইজন্য তিনি স্থানীয় ধর্ম্মানুরাগী লোকদিগকে উৎসাহ দিয়া মুঙ্গেরেই "আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার" প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে সভাপণ্ডিত-কর্ত্তৃক প্রথমতঃ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা হইত এবং পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা করিতেন। সভার অধীনে ব্রাহ্মণ বালকদিগের শিক্ষার্থ একটী সংস্কৃত পাঠশালাও স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকগণকে সদাচার ও সুনীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই সভা-গৃহেই "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা"নাম্নী একটী সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। ভারতীয় ধর্ম্ম-তত্ত্ব স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বিশেষভাবে হিন্দীভাষাও শিক্ষা করিলেন, এবং কোনরূপে অবকাশ পাইলেই স্থানে স্থানে গমন করিয়া তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায়, সুনীতি, স্বধর্ম্ম, সদাচার, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার মনোমোহন মধুর বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই স্বধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইয়া-

ছিলেন। অনেক উন্মার্গগামী ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মান্তরগ্রহণে বিরত এবং দেশীয় আচার ব্যবহার ও পূজাদির অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইলেন। মুঙ্গেরের পাদরী ইভান্‌স্ সাহেব বলিয়াছিলেন "আপনার বক্তৃতা-শক্তি পাইলে আমি একদিনেই সমগ্র জগৎ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি"। আদি ব্রাহ্ম সমাজের তাৎকালিক সভাপতি রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিকে লিখিয়া-ছিলেন—"আপনারা শীঘ্রই হিন্দুর আদর্শে ধর্ম্মপ্রচার না করিলে মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বত্রই আর্য্য-সভাসমূহ ব্রাহ্ম-সমাজকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে"।

মুঙ্গেরে আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষায় "ধর্ম্ম-প্রচারক" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, এবং জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত "ধর্ম্ম-প্রচারক" তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় যাবৎ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই "ধর্ম্ম-প্রচারকে" প্রকাশিত হইত। তাঁহার জীবিতাবস্থায় "ধর্ম্ম প্রচারকই" বঙ্গে হিন্দুসমাজের প্রধান মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের অনেক পুস্তকই প্রবন্ধাকারে "ধর্ম্মপ্রচারকে" প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও শিক্ষিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত আর্য্য-ধর্ম্ম-বিষয়ক সুবিচারপূর্ণ প্রবন্ধরাশি "ধর্ম্ম-প্রচারকে" মাসে মাসে প্রকাশিত হইত। মুঙ্গেরের সভাপ্রতিষ্ঠা ও "ধর্ম্মপ্রচারক" প্রকাশ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ভারতবাসিগণকে

স্বধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক পরধর্ম্ম-গ্রহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ নিতান্তই ব্যথিত হইত, এবং মনের সাধে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া সময় সময় নিতান্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নির্জ্জনে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

অবশেষে ১২৮৫ সালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হরিদ্বারের মহাকুম্ভ-মেলায় গমন করেন। তথায় শ্রীগুরুদেবের পুনর্দ্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহারই আদেশে স্বদেশবাসীর ধর্ম্মভাব বিকাশের জন্য প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। হরিদ্বারেই "ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী-সভা"র সূত্রপাত হইল। এই অবকাশ সময়েই তিনি আর্য্যসমাজ * ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক্ষেত্র লাহোর, আলিগড়, মজঃফরপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে সনাতন ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা শ্রবণে শিক্ষিতগণ স্বধর্ম্ম-ভাবে যেন পুনর্জ্জাগরিত হইয়াছিল। কলিকাতা আলবার্ট হলে "ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ" এবং গয়াধামে ৺ বিষ্ণুপাদমন্দিরে হিন্দী ভাষায় "ভারতের প্রেতত্বমোচন" বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে শ্রোতৃমাত্রই হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী ও হিন্দী ভাষার যে এরূপ তেজস্বিনী শক্তি আছে, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। গয়ার প্রচার-কার্য্যের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চাকরী ত্যাগ করিলেন, এবং এক বৎসরকাল ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, বাঁকিপুর,

* শ্রীদয়ানন্দসরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য-সমাজ।

কাশী প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারপূর্ব্বক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও সাধু-মহাত্মার আবাস এবং শাস্ত্র-জ্ঞানের আধার কাশীধামে ধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যের কেন্দ্র-স্থান স্থির করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পূর্ব্বোক্ত সভার অধীনে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক বিদ্যালয়ের বালক-গণের জীবন আর্য্যভাবে গঠনের উদ্দেশ্যে "সুনীতি" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা এবং ভারতের সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থ ইংরাজিতে "দি মাদারল্যাণ্ড্" নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে বঙ্গীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মদনগোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ এবং কাশীবাসী পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্য ও মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতিও ধর্ম্মপ্রচার-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

কাশীর সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র, রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, সি, আই, ই, ডাক্তার রামচন্দ্র সেন, পি, এইচ্, ডি-প্রমুখ প্রসিদ্ধ পুরুষগণ তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। বহরমপুরের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, পাকুড়ের রাজা তারেশচন্দ্র পাণ্ডে, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দীনবন্ধু সান্যাল, কুণ্ডলার জমিদার কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পুণ্যাত্মগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচার-কার্য্যে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন।

১২৯১সালে মাতার কাশীলাভের পর কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন প্রব্রজ্যা

অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কয়েক মাস শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল,এমন কি তাঁহার আরোগ্যের আশাও ছিল না। কিন্তু ভগবৎকৃপায় তিনি ক্রমে ক্রমে রোগ মুক্ত হইলেন। রোগমুক্তির পরও যে সময়ে তিনি বিশেষভাবে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য অত্যধিক ভ্রমণে অসমর্থ ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারগর্ভে সুললিত ব্যাখ্যা প্রণয়ন এবং নারদ ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা সহ ভক্তচরিত রচনা পূর্ব্বক "ভক্তি ও ভক্ত" নামে একখানি অতীব উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ধর্ম্ম-প্রচারকে তাঁহার ব্যাখ্যাত "রামগীতা"ও এই সময়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ সমূহ "শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি" নামে, উপাসনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি "পঞ্চামৃত" নামে এবং "সুনীতি" পত্রিকায় তাঁহার লিখিত উপদেশ সকল "নীতি-রত্নমালা" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সুস্থ হইয়া মহোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ সুমধুর ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশবাসিগণের হৃদয়ে নবশক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সময় হইতে তাঁহার উদ্যোগে, উৎসাহে, প্রেরণায় ও সূচনায় দেশে দেশে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা এবং সংস্কৃত-বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। হরিনামের সুমধুর ধ্বনিতে পুনর্ব্বার পুরপত্তনাদি নাচিয়া উঠিল।

যে সময়ে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুত্থানে হিন্দুধর্ম্ম টলটলায়মান—যে সময়ে হিন্দুসন্তানগণ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের বাহ্য চাকচক্যে বিমোহিত হইয়া হিন্দুর প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতামাতার স্নেহমমতা ত্যাগ করতঃ বিধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন—যে সময়ে হিন্দু পরিবার মধ্যে বিধর্ম্মের চপেটাঘাতে এক মহাক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেই সময়ে যেন মহামায়ার লীলাপটের অন্তরাল হইতে আবির্ভূত হইয়া, হিন্দুধর্ম্মের অপার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্যই আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি হিন্দুর ঘরে ঘরে আর্য্য-ধর্ম্মের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণ পুনরায় জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিষণ্ণ বদনে পুনরায় হাসির রেখা দেখা দিল। আর্য্য-ধর্ম্মের পুনর্জ্জাগরণের দিনে দেশবাসিগণ আবার গাহিতে লাগিলেন—

"বাজলো হরিনামের ভেরী গগনভেদী স্বরে।
আর্য্যধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িল অম্বরে॥
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি ভবের গণ্ডগোল।
সবে ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে বল হরি-বোল॥"

এইরূপে মণিপুর হইতে পঞ্জাবপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের বহুদিন-সঞ্চিত অহিন্দুভাবের রোগরাশি স্বামীজীর সুমধুর ব্যাখ্যারূপ মহৌষধে উপশমিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি গুরুদত্ত সন্ন্যাসাশ্রমোচিত শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদ-শিক্ষার্থ তিনি কাশীধামে বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং মা অন্নপূর্ণার দৈবাদেশে যোগাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক

তথায় শ্রীশ্রী৺যোগেশ্বরী মাতার প্রতিষ্ঠা ও সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার স্বরচিত গীতার্থসন্দীপনী ও বক্তৃতা প্রভৃতি গ্রন্থের আয় হইতেই যোগাশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি সেবাদিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী উত্তর ভারতের অনেকানেক নগরে এবং অসংখ্য পল্লীগ্রামেও ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুচবিহার, শিলং, দার্জ্জিলিং, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বেরেলী, বরিশাল, বহরমপুর, মুঙ্গের, মুর্শিদাবাদ, মজঃফরপুর, মিরাট, কাশী, প্রয়াগ, গয়া, ছাপরা গাজিপুর, লাহোর, দিল্লী, শিমলা, জলন্ধর, রাউলপিণ্ডি পেশোয়ার প্রভৃতিই প্রধান। সহবাস-আইন পাশের আন্দোলন উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলের বিরাট্ সভায় এবং গড়ের মাঠের দুই লক্ষ শ্রোতার মধ্যে পরিব্রাজকের বক্তৃতা ঢাকা ও ময়মনসিংহের তুমুল ধর্ম্মান্দোলন,দার্জ্জিলিং ও শিমলা-শৈলে, কাছাড় ও শ্রীহট্টে, বেরিলী ও বরিশালে কাশীর গঙ্গাতটে ও টাউনহলে, গয়াধামে ৺গদাধরের মন্দির-প্রাঙ্গণে ও দিল্লী-ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলে "পরিব্রাজকের বক্তৃতা এখনও যেন অনেকের শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটী মাত্র "পরিব্রাজকের বক্তৃতায়" প্রকাশিত হইয়াছে। উহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি সুন্দর অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বহরমপুরে পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া স্যার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয়

বলিয়াছিলেন, "ইউরোপেই এরূপ বক্তার সম্মান হইতে পারে, আমাদের দেশের লোক যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানে না।" কলিকাতা টাউন-হলের বিরাট্ সভায় সভাপতি স্যার্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতান্তে বলিয়াছিলেন,"বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি জানিতাম না। বক্তৃতায় যে অবিরল ভাব-স্রোত চলিয়াছিল তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই সঙ্গত হইত"। তিনিই আবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চীফ জষ্টিস্ স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা শুনিয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন "আপনার বক্তৃতা ভাষা নহে, ইহা ভাবের প্রবল স্রোত, সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়"। পরিব্রাজক মহোদয় যখন ঢাকায় তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করিতেছেন, তখন বঙ্গবাসীতে লিখিত হইয়াছিল—"কিছু দিন পূর্ব্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে ঢাকায় একটী যুগ-প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুশুভ সমাগমে আর একবার আর একরূপ প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। পূর্ব্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল এ ঝড়ে অমৃতবৃষ্টি হইয়া গেল। বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র প্রভৃতির বক্তৃতার প্রশংসা প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী বলিয়াছিলেন"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বক্তৃতা স্রোতে একদিন বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় ভাব ছিল ভাষা ছিল, উদ্দীপনা ছিল, অগ্নিকণা ছিল, আর ছিল করুণ-রসের নির্ঝরিণী"। (বঙ্গবাসী, ৫ই আষাঢ়, ১৩১০)। তিনি সময় সময় এক দিন ২।৩টী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও কাতর হইতেন না, এবং

বক্তৃতাকালে ভয়ঙ্কর রোগ-ক্লেশও বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবিশ্রাম-বর্ষিণী দ্রুত-তরঙ্গিণী ভাবময়ী ভাষা অননুকরণীয়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রথম বয়স হইতেই সুমধুর সঙ্গীত ও সুললিত কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লাভের পর হইতে তিনি যে সমস্ত সঙ্গীত জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে "পরিব্রাজকের সঙ্গীত" নামে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র সাধন-জীবন তাঁহার নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

জীবনের মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ সময় স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবায় অতিবাহিত করিয়া জীবন-সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে সহস্র সহস্র সাধুমণ্ডলীমধ্যে ও নানা দিগ্‌দেশাগত গৃহস্থ স্ত্রীপুরুষদিগের ঐকান্তিক আগ্রহে ভগবৎ-প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে "গঙ্গাসাগর-মহিমা" কীর্ত্তনপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যের পরিসমাপ্তি করেন। তৎপরবর্ষে তিনি পৃষ্ঠব্রণ-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে কলিকাতায় আসিয়া সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে "খেলাত ঘোষের ইনষ্টিটিউশনে" তিনি "ধর্ম্ম ও উপাসনা" সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বহুমূত্র-পীড়ার প্রাবল্যে ১৩০৯ সালের ৩রা আশ্বিন ৫৩ বৎসর বয়সে অবিমুক্তপুরী ৺কাশীধামে দেহ ত্যাগ করিলে উহা মণিকর্ণিকাঘাটে উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পবিত্র গর্ভে সমাহিত হয়।

"স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত স্বদেশীয়দিগের

হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্কুল বিদ্যালয়ের বালকবর্গের চরিত্র গঠনের জন্য তাঁহারই চেষ্টা ও প্রেরণায় বঙ্গের প্রায় প্রতি প্রধান নগরে এবং পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত "সুনীতি-সঞ্চারিণী" সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশহিত-ব্রতে অনুরাগ তাঁহারই জীবন-ব্যাপিব্রতের সুফল বলিতে হইবে। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সহিতই যে স্বদেশানুরাগ ও চরিত্রবল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, বঙ্গমাতার সুসন্তান-গণের জীবনে তাহা এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।"

"বর্ত্তমান সময়ে দেশের জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ-সন্তানেরা অর্থসামর্থ্যের অভাব হইলেও, স্বীয় জীবন দিয়া কিরূপে স্বদেশের সেবা করিতে পারেন, তাহা পরিব্রাজক মহোদয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশ-সেবার জন্য ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে যে কৌমার ব্রতই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহা তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ভারতমাতার উৎসাহী দরিদ্র সন্তানেরা এই মহদ্ ব্রত অবলম্বন করিলে, অনায়াসেই যে বিবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাতৃপূজায় অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। কত কত উন্নতমনস্ক যুবক অকারণে সংসারা-বদ্ধ হইয়া যে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে মন বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠে। আশা করি পরিব্রাজক স্বামীজীর সাধু দৃষ্টান্ত হিন্দু-যুবকগণের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।"

(ঢাকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত)

জগতে যখন যে কোন মহানুভব পুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা কোন না কোন প্রকারে তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-প্রচারক ও সংস্কারকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোক পদে পদেই বিদ্যমান। ধর্ম্মরাজ্যে স্বামীজীর অতিশয় প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও বাগ্মিতার প্রভাবে তাঁহাকে যশস্বী ও প্রতিভাযুক্ত এবং বৈদ্যবংশে জন্ম হইলেও তাঁহার সন্ন্যাসি-জীবনে তাঁহাকে ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা পাইতে দেখিয়া অনেক ক্ষুদ্র-হৃদয় লোক ঈর্ষার জ্বালায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যে কোনরূপে স্বামীজীর অপযশঃ ঘোষণায় ও অনিষ্টসাধনে, এমন কি তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তিনি শত্রুদিগের দ্বারা নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইয়াও যে আবার স্বদেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার মহিমা চিরদিন বিঘোষিত হইবে। ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন কত কষ্টকর এক্ষণে স্বদেশ-সেবক মহাত্মগণ নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করিয়া পরিব্রাজকের জীবনব্যাপি মহাব্রতের মাহাত্ম্য আরও বিকাশিত করিতেছেন। তাঁহার মহাজীবনের যে আভাস সম্প্রতি স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, শাস্ত্র, সাহিত্য ও সমাজ-সেবক মহাত্মগণের চরিত্র-গাথায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি,এ, প্রণীত 'তর্পণ' নামক পুস্তকের সেই কবিতাটী (সনেট্) পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন।

(শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)

"সুদূর অতীত হ'তে এখনো শ্রবণে
ধ্বনিছে সে অগ্নিবাণী, প্রোজ্জল উচ্ছ্বাস—
মেঘের গর্জনে মিশি, ঝটিকার শ্বাস—
ভাষার রাগিণী—যুক্তি-আবেগ-মিশ্রণে
তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছুটাইত মনে।
ধর্ম্মের সুষুপ্তি-ভঙ্গে, অদম্য প্রয়াস,
হিন্দুধর্ম্ম-অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস,
এখনো মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে।

তোমার সে মোহকরী বাণী উন্মাদনা,
পাশ্চাত্য-আদর্শ-পূজা, করেছিল রোধ :
স্বধর্ম্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা,
জাগ্রত করেছে আর্য্য-মহত্বের বোধ।
বাগ্মিতায়, বঙ্গে তব ছিল না তুলনা,
নারিবে করিতে বাণী, তব ঋণ শোধ।

অবতরণিকা ও আভাস।

নীতি-শিক্ষা

"বর্ত্তমান ভারতবর্ষ চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, পদ থাকিতে পঙ্গু ও জীবন থাকিতে মৃত। ভারত দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে কার্য্য করিতে পারিলেও করিবে না, বুঝিয়াও বুঝিবে না, গিয়াও জাগিবে না। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বিষ্যভারতের চিন্তা করিলে চিন্তাশীল মহাত্মামাত্রেরই চিত্ত চকিত য়া উঠে। বিশ্ব-বিস্থালয়ের দুই চারিটী উপাধি, কিছু ঐশ্বর্য্য ও জকীয় সম্মানসূচক দুই একটী পদবী লব্ধ হইলেই বর্ত্তমান ভারত জ জন্ম সার্থক ও জীবন সফল মনে করেন। এই গুলি ভিন্ন বনের অন্ত কিছু বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কিনা, তাহা চিন্তা রিবার অবকাশ অনেকেরই নাই। ভারতবাসী বাল্যকালে বিতাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব-বিস্থালয়ের নিয়মিত সঙ্কীর্ণ ক্ষাসোপানে আরোহণার্থি কঠোর পরিশ্রমসহ দিবানিশি যত্নবান্, শিক্ষার ক্রমাগত কঠোর শ্রমে ক্লান্ত হইয়া যৌবনাবস্থায় প্রবেশ রিয়াই শিক্ষার অপেক্ষাকৃত উন্নত সোপানে অধিরোহণ করিতে তান্ত অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং আরও অগ্রসর হইলে শিক্ষার দিব্য মনোহর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রায় অনেকেরই গ্যে ঘটিয়া উঠে না। শীতার্ত্ত ব্যক্তি ইন্ধন আহরণ করিল, কিন্তু গ্যদোষে যত্ন ও অবধানের অভাবে অগ্নিতাপ সেবন করিতে ইল না। জীবনের গূঢ় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কিরূপে কিছু

ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, কি উপায়ে মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, নব্য ভারত তজ্জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়। বৃদ্ধগণ গত জীবনের সংস্কারের বশীভূত, সুতরাং তাঁহারও শিক্ষার পরম সুধাস্বাদে বঞ্চিত। বিনা-চিকিৎসায় ও অসাবধানতায় ভারতের বিষম ব্যাধি বাড়িতে লাগিল, পরমায়ুঃ-সত্ত্বেও ভারতের আসন্ন কাল বুঝি উপস্থিত!

"ভারতনিবাসিগণ পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্যের পরম সমাদর করিতেন। ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস না করিয়া তাঁহারা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন না। ব্রহ্মচর্য্যকালে তাঁহারা বিদ্যা, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি জীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্যগুলি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া গুরু-গৃহ হইতে লোক-সমাজে প্রবিষ্ট হইতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা যে দিন হইতে আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই এই পুণ্যভূমি দুর্ব্বলতা, দুরাগ্রহ, দুর্ব্ব্যবহার, ভ্রষ্টাচার, ভীরুতা, চপলতা, অব্যবস্থিত-চিত্ততা আদি মানসিক ক্ষীণতা ও মলিনতার প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিকালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও বিবিধ সাধারণ নীতি শি[illegible]পাইয়া ভারতবাসিগণ তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, বাহুবল, [illegible] আদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া এই পবিত্র ভূমি [illegible]-সমাজের শিরোভূষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ে[illegible] প্রণালীর দোষে ও পিতা-মাতা আদি গুরুগণের তত্ত্বাবধা[illegible] ও যত্নের অভাবে সুকুমারমতি বালকবর্গ স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজকে কলঙ্কিত ও বিষম উপদ্রবগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। পিতামাতা,

সন্তানের শৈশব হইতেই যদি নীতিশিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়েন, তবে তাঁহারা ও সন্তানগণ চিরসুখী হইতে পারেন এবং সমাজও নিরুপদ্রব থাকে। বালকের হৃদয় যে উপাদানে গঠিত হইয়া যায় "বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহা আপনা আপনিই সংশোধিত হইয়া যাইবে" পিতামাতার এই বিষম ভ্রম দূর না হইলে ভবিষ্যতের কল্যাণ নাই। পিতামাতার ঔদাস্য ও উপেক্ষা বালকবর্গের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতামাতা যদি সন্তান হইতে সুখী হইতে ও সন্তানকে সুখী করিতে চাহেন, তবে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া বালকগণের সুনীতি-শিক্ষার উপায় বিধান করুন। সাধারণ সমাজে নীতি-শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত হইলে বৃথা কলহ, বিবাদ, বিসংবাদ, অসভ্যতা, মূর্খতা, ধৃষ্টতা, ধূর্ত্তা, কপটতা, প্রবঞ্চনা আদি সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; বিচারালয়ে এত মিথ্যা অভিযোগ ও তজ্জন্য অযথা অর্থ-ব্যয়ও হয় না; দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, বেশ্যালয়-গমন, মদ্যাদি সেবন জন্য মহাপাপ এবং সমাজে দারিদ্র্যদুঃখ বৃদ্ধি হয় না; সামান্য প্রভুত্ব লাভের জন্য নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিতও হয় না; অধিক কি সমাজ নিতান্ত নিরুপদ্রব হইয়া উঠে। নীতি-শিক্ষা দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারা যায়। পারিবারিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতাই সুনীতি-শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

"নীতি-শিক্ষার অভাব যে বর্ত্তমান ভারতকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, তাহা অবশ্যম্ভাবি-সত্য। রাজকীয় শিক্ষাভবনে ও

অনুশাসন-মন্দিরে ইহার কোন বিধান হইল না দেখিয়া "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা" ভবিষ্যৎ ভারতের ভূষণস্বরূপ স্নেহভাজন কোমল হৃদয় তরলমতি বালকবর্গকে কল্যাণ-তরুর শীতল ছায়ায় সুখী করিবার নিমিত্ত "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" স্থাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই অনেক স্থানে উক্ত সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভাসমূহের শিক্ষা ও উপদেশগুণে বালক-বর্গের প্রকৃতি ও চরিত্র অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যে সকল বালক ও যুবা সন্ধ্যা ও গায়ত্রী পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতেন না, এই সভাসমূহের উত্তেজনায় তাঁহাদের প্রকৃতি আজ কাল আর্য্য-ভাবাপন্ন হইয়াছে, ভগবান্ এই সভার সংখ্যা ও মঙ্গল বৃদ্ধি করুন। স্বর্গনিবাসী আর্য্যমহাত্মগণ নিজ নিজ তৈজস শক্তি সহযোগে ভারতের হৃদয়তন্ত্রী আকর্ষণ করুন। আর্য্য-রীতিনীতি ভারতে পুনঃ প্রচারিত হইলে ভারতের মলিন মুখ নবশ্রী ধারণ করিবে। মনের বল, হৃদয়ের উত্তেজনা ও ভাবের পবিত্রতা ভারতে পুনরাগত হইয়া এই মলিন ভূমিকে পুনঃ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিবে। আবার আমরা আর্য্যদিগের জাতীয় গৌরব পুনরধিকারে সমর্থ হইব। পবিত্র হৃদয়ের পরম সখা স্বয়ং ভগবান্ আমাদের নেতা হইয়া পরমধামে লইয়া যাইবেন" (ধর্ম্ম-প্রচারক ৬ষ্ঠ ভাগ, ৫ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)।

ধর্ম্ম-শিক্ষা

"লোক সমাজে দুর্ভাগ্যবশতঃ যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে পরম-দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় দেখিবার অবসর অতি অল্প! জন্মজন্মান্তরে আমি ধারাবাহিকক্রমে যে দুঃখ-রাশি ভোগ করিয়া আসিতেছি,

তাহারই পরম নিবৃত্তি আমার প্রার্থনীয়। নূতন দুঃখ রচনা করিয়া তাহা প্রশমিত করিয়া সুখ অনুভব করা আমার ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য নহে। দয়া দ্বারা পরদুঃখ-বিমোচনে যে সুখ হয়, সেই সুখ লাভ করা দয়ার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রথমে আমি যে আপনার দুঃখ ভাবিতেছিলাম, পরের দুঃখ ভাবিতে গিয়া আমার সেই দুঃখ আর স্থান পাইল না, আমার দুঃখ নিবৃত্ত হইল, ইহাই দয়াধর্ম্মের পরম ফল। যে দিন দেখিবে আমার স্বীয় দুঃখের জন্য আর আমার উদ্বেগ হয় না, সে দিন অন্যের দুঃখ দেখিয়াও আমার দয়ার সঞ্চার হইবে না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এইরূপে অসৎ প্রবৃত্তিরাশিকে সংহার করিয়া অবশেষে আপনারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞান-যোগিগণ ধর্ম্মসাধন দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন, সুখে বা দুঃখে সম্পদে বা বিপদে আর বিচলিত হয়েন না।

এক্ষণে দেখিলাম আমাতে যে সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত দুঃখরাশির নিবৃত্তি করিবার ও ভবিষ্যৎ দুঃখ-রাশির প্রবেশ-পথ রোধ করিবার জন্য। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল যদি শৈশব হইতেই দুর্জ্জয় দুঃখরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-নিচয় কোন কালেই নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিতে পারিবে না। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ বালকের উপনয়ন-কাল উপস্থিত হইলেই—কার্য্যক্ষেত্র ও লোক-সমাজ হইতে অতি দূরে গুরুর আশ্রমে রক্ষা করিতেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলের সুগঠন, বল ও পুষ্টি হইত। অতঃপর গার্হস্থ্য আশ্রমে—সংগ্রাম-ক্ষেত্রে

প্রবেশ করিয়া বর্ত্তমান কালের আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বলের ন্যায় সংসারের পদতলে বিলুণ্ঠিত ও দুষ্ক্রিয়ার তাড়নায় বিড়ম্বিত হইতে হইত না। এখন সত্য কথা কহিয়া নির্য্যাতিত হইলে আমরা দুঃখাশ্রু বিসর্জ্জন করি, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্লেশে পড়িয়াও অম্লান-বদন ও অক্ষুণ্ণ-চিত্ত থাকিতেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা সুগঠিত ও পূর্ণপুষ্টিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সত্যের রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের অপুষ্ট, দুর্ব্বল সত্য-নিষ্ঠা লোভের সামান্য সংগ্রামে—সংসারের কটাক্ষ-তাড়নায়—অভিভূত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া থাকি সত্যে সুখ নাই, তাই মিথ্যা কথনে প্রবৃত্তি হয়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রকৃতরূপে পুষ্ট হইলে আমরা সাধারণতঃ যে ক্ষুদ্র সুখের জন্য ধর্ম্মের সেবা করি, ধর্ম্ম তৎপরিবর্ত্তে আমাদের আশাতীত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, সঞ্চিত ও অনাগত দুঃখ-নিবৃত্তির—দুঃখ-সাগর-পারের—সুদৃঢ় সোপান রচনা করিয়া দেন। ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা প্রথমতঃ ধর্ম্মের সেবা করি না, বরং ধর্ম্মকেই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়া রাখি। একে আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল অপুষ্ট রহিল, আবার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় আমাদের কার্য্য করিতে লাগিল। সুতরাং ধর্ম্ম আমাদিগকে পরম সুখ দিবেন কোথা হইতে? আমরা যেন যথোচিত ধর্ম্মের সেবা করিতে—ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা ধর্ম্মকে পুষ্ট করিতে শিক্ষা করি। সামান্য সুখের জন্য যেন ধর্ম্মকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত না করি। ধর্ম্ম আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন।

"আর্য্য-শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ ও শ্রুতি বারংবার উচ্চ ও গম্ভীর নিনাদে

জীবকে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ কল্যাণ লাভের জন্য সৎপরামর্শ ঘোষণা করিতেছেন। জীব! অমনোযোগী ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া নিজ সুখের কণ্টক বিস্তার করিও না। বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইও না। বাল্যকালে বা যৌবনকালে ধর্ম্মসাধন না করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় করিবে, এ ভাবনা পরিত্যাগ কর। কেননা—

"ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে।"

মৃত্যু মনুষ্যের সময়াসময় প্রতীক্ষা করে না, অতএব মনুষ্যের ধর্ম্মসাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন সদাই মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সময়েই শোভা পায়।"

(শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি হইতে উদ্ধৃত)।

আমাদের ধর্ম্মভাবের অবনতির কারণ কি?

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ঋষিগণ যে আর্য্য ধর্ম্ম যাজন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সংখ্যা অধিক না হউক আজও তাঁহাদের অভাব নাই। আজও ভারতবর্ষে বেদ, দর্শন, স্মৃতি আদি শাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা হইতেছে। যে যে উজ্জ্বল রত্নের গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত, তাহার জ্যোতিঃ আজও ভারতে বিকীর্ণ হইতেছে। ভারতবর্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী ভারতীয় ভাবের পক্ষপাতী বক্তারও আজকাল অভাব নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের অবনতি হইতেছে, ইহার কারণ কি? এত

চেষ্টা বিফল হইতেছে ইহার কারণ কি ? প্রধানতঃ ইহার চারিটী কারণ আমাদের দৃষ্টিপথে প্রতীয়মান হইতেছে।

প্রথম—শিক্ষা-বৈষম্য।—আমাদের দেশে এক্ষণে অসংখ্য বিদ্যালয়, অসংখ্য পাঠশালা। এই সকল বিদ্যালয়ে অসংখ্য বালক, বালিকা ও যুবক বিদ্যা লাভ করিতেছে এবং আমরাও ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। অধুনা বিদ্যার আদর অধিক এ কথা আমরা শতমুখে ও শত উপায়ে ব্যক্ত করিতেছি। কিন্তু কে কি শিখিতেছে, তাহা কি আমরা দেখিয়া থাকি ? কাহার কোন্ পুস্তক পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে তাহা কি বিবেচনা করিয়া থাকি ? বৃদ্ধের পাঠোপযোগী পুস্তক বালক পাঠ করিতেছে, বালকের পাঠোপযোগী পুস্তক বৃদ্ধ পাঠ করিতেছেন। স্ত্রীলোকের উপযুক্ত পুস্তক পুরুষ পাঠ করিতেছে এবং পুরুষের উপযুক্ত পুস্তক স্ত্রীলোক পাঠ করিতেছে। আমরা বলিয়া থাকি জ্ঞান লাভ করিলেই হইল ; কিন্তু কাহার কিরূপ জ্ঞান হওয়া উচিত্ সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নাই। বালক যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী পাঠ করিতেছে দেখিয়া আমরা বিবেচনা করি যে সে জ্ঞান লাভ করিতেছে। কিন্তু বালক অপ্রাপ্তবয়স্ক, সে এই সকল আত্মতত্ত্বযোগ-সাধনের উপযোগী উচ্চ-তত্ত্বের বিষয়ে কি জ্ঞান লাভ করিবে ? সে কেবল কতকগুলি অসম্বদ্ধ কথা শিখিতেছে এই মাত্র। বালককে এ বিষয় হইতে নিবৃত্তও করা যাইতেছে না। যে নিয়মক্রমে—যে রীত্যনুসারে বালক-প্রকৃতিতে জ্ঞান লাভ হইতে পারে, সে নিয়মানুযায়ী পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে না, বালকও পাঠ করিতে পাইতেছে না।

বালকের জ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত পুস্তক না দিতে পারিলে সে অনুপযুক্ত পুস্তক অগত্যা পাঠ করিবে। আর্য্য-শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে স্বকীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যের অগ্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করা উচিত, পরে গুরু ও বেদান্ত বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমশঃ অধ্যাত্ম রাজ্যে—অনুভবের রাজ্যে প্রবেশ করা উচিত। এই রীতিক্রমে যিনি আপনার উন্নতি কামনা করিবেন, তিনিই কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা করিল, তাহার কি আর পরে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে শ্রদ্ধা হইতে পারে? 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য পাঠ করিয়া কি আর অত্রি-সংহিতাতে কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে? আবার অত্রি-সংহিতার লিখিত নিয়মাদি পালন না করিলে শরীর ও চিত্তে শুদ্ধিও হয় না এবং তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে জ্ঞানের প্রকৃত স্ফূর্ত্তিও হয় না। এই জন্যই আমাদের দেশে আজকাল বচন-বিজ্ঞের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে, ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না।

দ্বিতীয় কারণ—বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা রীতি। যখন এই রীতি আমাদের দেশে—বিদ্যালয় সমূহে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল তখন ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। তখন বিদ্যালয়ে এত অধিক পরিমাণে লোক পাঠাভ্যাস করিতে যাইত না—তখন চতুষ্পাঠীতেও কতকগুলি লোক পাঠাভ্যাস করিত। এক্ষণে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অতিশয় অল্প এবং রাজকীয় বিদ্যালয় ও তদনুকরণে স্থাপিত অপর বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এই সকল

বিদ্যালয়ে শীঘ্র শীঘ্র বালক যাহাতে সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু শিক্ষা করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হয়। কোন এক শাস্ত্রে বালকের বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইল কি না তদ্বিষয়ে শিক্ষকদিগের দৃষ্টি নাই, কিন্তু সকল শাস্ত্রের আস্বাদন বালক পাইয়াছে কি না, সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি। বাল্যকালে স্মৃতিশক্তি প্রবল থাকাতে বালকেরাও অনায়াসে দর্শনাদি দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র সকল কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিষ্ঠাপত্র-লাভে আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করে। কিন্তু শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করা এক কথা এবং ব্যুৎপত্তি লাভ করা আর এক কথা। এইরূপে সুন্দর ব্যুৎপত্তি লাভ না হওয়াতে শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসও দৃঢ় হইতেছে না এবং শাস্ত্রবিহিত কার্য্যেও কাহার প্রীতি হইতেছে না।

তৃতীয় কারণ—বিদ্যালয়ে আজকাল প্রকৃতির বিচার নাই। কাহার কিরূপ মানসিক বৃত্তি, কাহার কতদূর অধিকার তাহা বিবেচনা করিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এক শ্রেণীর পঞ্চাশৎ বা একশতটি ছাত্রকে একভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহাদের প্রকৃতিগত যতই কেন বৈষম্য থাকুক না, সকলকেই একরূপে শিক্ষিত হইয়া এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই সকল ছাত্রদিগের বয়স বা বুদ্ধির তারতম্য বিচার করা হয় না। ঈশ্বরের রাজ্য যে এত সুন্দর দৃষ্ট হয় তাহার কারণ ইহার বিচিত্রতা—ইহার বিবিধত্ব। বিবিধ মনুষ্যের বিবিধ প্রকৃতি। এইরূপ শিক্ষাতে সেই বিবিধত্বের সেই সৌন্দর্য্যের নাশ করা হইতেছে। সেই জন্য বর্ত্তমান শিক্ষাতে কোন ব্যক্তিরই মানসিক ভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে না।

চতুর্থ কারণ—মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার সামঞ্জস্য নাই।
সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে বিদ্যালয়ে মানসিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরিক চেষ্টার শিক্ষাও অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু তত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি মানসিক শিক্ষায় পারদর্শী, শারীরিক ব্যায়ামাদিতে সে ব্যক্তি একেবারে অনভ্যস্ত। আবার যে ব্যক্তি ব্যায়ামাদিতে বিলক্ষণ পটু, সে মনোবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। মন ও শরীরকে সমভাবে রক্ষা করিতে না পারিলে মনুষ্যের প্রকৃত সুখ হয় না। কেবল মানসিক বল অথবা কেবল শারীরিক শক্তি লাভ করিয়া প্রকৃতরূপে কে সুখী হইয়াছে? যে ব্যক্তির মন অত্যুন্নত এবং শরীর অত্যন্ত হীন, সে কি মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে? এবং যাহার মন এক রাজ্যে এবং শরীর আর এক রাজ্যে, সে কি প্রকারে সুখের আশা করিবে? এ স্থানে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে এ সকল নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষার কথা। আমাদের দেশে পূর্ব্বে ব্যায়ামাদির অনুশীলন ছিল না, এক্ষণে হইতেছে, ইহা সুখের বিষয় বলিয়া আনন্দানুভব করা উচিত। হায়! আমরা অধুনা এমনই আত্ম-বিস্মৃত বটে। একথা আমাদের বলিবার সময় আসিয়াছে বটে। আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের কার্য্য-কলাপ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। পূর্ব্বে যোগাদি আধ্যাত্মিক সাধনের সঙ্গে ঋষিরা যে আসনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এই এক একটী আসন আমাদের একটী একটী ব্যায়াম এবং মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার অনুকূল ব্যাপার ছিল। আধুনিক ব্যায়ামে

শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু আসনানুষ্ঠান-রূপ পূর্ব্বতন ব্যায়ামে শরীর পুষ্ট, দীর্ঘকাল স্থায়ী ও অনেক রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সকল আসনকে যেন সকলে সহজ মনে করিবেন না। অধুনাতন ব্যায়াম-কুশল ব্যক্তিগণও যদি ইহার একটী আসনের অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও বিশেষ পরিশ্রমে শিক্ষা করিতে হয়। তাই বলিতেছি ঋষিদিগের প্রসাদে আমাদের দেশে কোন তত্ত্বই অনাবিষ্কৃত ছিল না। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বলের সম্যক্ সঞ্চার হয় তাঁহারা সে সকল বিদ্যারই বিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হতভাগ্য সন্তান আমরা তাহার আলোচনা ত্যাগ করিয়াছি! নিত্য পূজা উপাসনার সময়ে প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং আসন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও চেষ্টার সামঞ্জস্য হইত। এই দুই চেষ্টার পরস্পরের সহিত এরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে একটির অভাবে আর একটি অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুন্দর রূপে জানিতেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তাঁহারা আসন না করিয়া প্রাণায়াম ইত্যাদি করিতেন না। তাঁহারা এতাবৎ যোগাঙ্গ-সাধন বলে সুস্থশরীর, দীর্ঘায়ু, পরিণত ও নির্ম্মল-বুদ্ধি এবং আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানশীল হইয়া সংসারের সমস্ত বিঘ্ন বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত হইতেন। এক্ষণকার বিদ্যালয়ে প্রচলিত ব্যায়ামকে আমরা মন্দ বলিতেছি না, কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের অনুকূল নহে. ইহাই বলিতেছি মাত্র।

ভারতবাসিগণ ! আর্য্যসন্তানগণ ! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের আত্মীয়ময় সমাজে কি ঘোর বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমরা ধীরে ধীরে কোন্ দূরদেশে যাইতেছ—তাহা দেখ, দেখিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে কৃতসংকল্প হও, জাতীয় ভাব রক্ষা কর। বাল্যকাল হইতে তোমরা বিদেশীয় রীতিনীতি শিক্ষা করিয়া তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদিগের উপাদেয় শাস্ত্রের উপাদেয় উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছ সত্য, কিন্তু তোমরা এক্ষণে তোমাদের অন্যায় কার্য্যকে অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ। যাহাতে তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের মত বিপদে না যায় তাহার চেষ্টা কর। যাহাতে তোমাদের ভাবী বংশধরেরা জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় উপাসনা, জাতীয় আচারব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া জগতে পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে তাহার চেষ্টা কর। তোমাদের কামনা এক্ষণে তাহাদের শক্তিতে সঞ্চারিত করিয়া নিশ্চিন্ত হও। হতাশ হইও না, হতাশ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। (জামালপুর সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার উৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের প্রদত্ত উপদেশের স্থূল মর্ম্ম, ধর্ম্ম-প্রচারক, ৭ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা। ১৮০৬ শকাব্দা চৈত্র)

নীতি-রত্নমালা।

সদুপদেশ।

১। পিতা মাতা সুশিক্ষিত হউন বা অশিক্ষিতই হউন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিবে। তাঁহারা সমাজে গণনীয় বা মাননীয় না হইলেও তুমি সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করিবে না। অগ্রজ, শিক্ষকাদি গুরুজনের নিকট সদাই অবনত থাকিবে।

২। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত অকপট-সৌজন্য সহ সদ্ব্যবহার করিবে। উপকারীর নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকিবে।

৩। যাহাতে প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে শান্তি ও মিত্রতা বৃদ্ধি হয়, তাহাই করিবে; যেন বিবাদ বিসংবাদের সূত্রপাত না হয়, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

৪। কৃষক, তন্তুবায় আদি ব্যবসায়িগণকে নীচ শ্রেণীর লোক মনে করিয়া ঘৃণা করিও না, কারণ তাহারা তোমার আহার ও আচ্ছাদনের সহায় ও পরম মিত্র।

৫। অসৎ কার্য্যে অর্থব্যয় করিও না, তাহা হইলে অসদুপায়ে ধন সংগ্রহ করিতে হইবে না। যিনি মিতব্যয়ী, লক্ষ্মী তাঁহাকে অত্যন্ত অনুরাগ করেন।

৬। পাঠশালা ও বিদ্যালয় তোমাকে বাচনিক শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; তোমার প্রকৃতির উন্নতি সাধন করাই তত্তাবতের উদ্দেশ্য। যদি পুঞ্জায়মান পুস্তক পাঠ করিয়া তোমার প্রকৃতি পবিত্র না হয়, তবে পঠনপরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে জানিবে।

৭। বিজাতীয় রীতি, নীতি, আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ কর। দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি কর।

৮। ভোজন, ভাষা, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্ম এই চারিটী জাতীয় পরিচয়। এতাবৎ স্বদেশীয় রীতিতে ব্যবহার ও অনুষ্ঠান না করিলে জাতীয় প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়।

৯। অশিক্ষিত লোকসকলের প্রতি সর্ব্বদা সকরুণ

ব্যবহার করিবে। তাহাদের সহিত সময়ে সময়ে একত্র মিলিত হইয়া তৎকালোচিত বৈষয়িক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সার ও সরলাংশ লইয়া বার্ত্তালাপ করিবে।

১০। এরূপ সভ্যতা শিক্ষা করিও না, যাহাতে সদাচার ও ধর্ম্মের হানি হয়।

১১। যে কার্য্যে অধিক লোকের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাতে তুমি স্বয়ং আপাততঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাহা সম্পাদন করিবে। কেননা উহাতে পরিণামে তোমারও মঙ্গল হইবে।

১২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে সুশিক্ষা দান করিবে, তাহা হইলে তাহারা সুপথে থাকিয়া চিরসুখী হইতে পারিবে।

১৩। লোকের মুখে শুনিয়া কোন ব্যক্তির নিন্দা ঘোষণা করিও না। পরনিন্দা করিলে জিহ্বা অপবিত্র ও মন কলুষিত হয়।

১৪। সাধুগণের বাহ্য কার্য্য মাত্র দেখিয়া তাঁহাদের প্রকৃতির বিচার করিও না। তাঁহাদের অন্তঃকরণ অগ্নির ন্যায় জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল। কিন্তু বাহ্য কার্য্য ধূমের ন্যায় মলিন বলিয়া বোধ হয়।

১৫। দুষ্ট ও দুরাত্মগণকে আশ্রয় দান করিও না, তাহাদের সংস্রবে সদ্ব্যক্তিকেও দণ্ডিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়।

১৬। লোভী পুরুষের সহিত কখনও মিত্রতা করিও না। কেননা লোভিগণ নিঃস্বার্থভাবে তোমার সুখদুঃখে সহায় হইতে পারিবে না।

১৭। যখন অপরকে কোন উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইবে, তুমি স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান কর কি না, তাহা বিশেষ রূপে দৃষ্টি করিবে। বাক্যে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা কার্য্য দ্বারা শিক্ষা দেওয়া শ্রেষ্ঠ।

১৮। নিজ পরিবারের বা মিত্রবর্গের অথবা আর কাহারও গুহ্য কথা সাধারণ ক্ষেত্রে কখনও ঘোষণা করিও না।

১৯। যে বাক্য প্রমাণ করিতে পারিবে না, তাহা সহসা কাহাকেও বলিও না।

২০। শত্রু হউক বা মিত্র হউক তোমার গৃহে সমাগত হইলে তাহার সৎকার করিবে। অভ্যাগত ব্যক্তিকে কখনও অনাদর করিও না।

২১। যে সভায় অনেক লোক উপস্থিত, সেখানে সাবধানে কথা বার্ত্তা কহিবে কেননা তথাকার সকলেই

তোমার অনুকূল বা স্বধর্ম্মী নহে। যাহা সত্য ও সপ্রমাণ তাহাই নির্ভীক হৃদয়ে প্রকাশ করিবে।

২২। যে শুভকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ ও সুসম্পন্ন না হইলে কাহারও নিকট ঘোষণা করিও না।

২৩। যৌবন কাল অতিশয় সঙ্কটাকুল, কিন্তু এই সময় পুরুষার্থ সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহাকেই পূজ্য, তাঁহাকেই মহাত্মা ও তাঁহাকেই পুরুষপুঙ্গব বলিয়া জানিবে, যিনি যৌবনের বিপুল বিঘ্ন-রাশিকে ধৈর্য্য ও সংযম দ্বারা অতিক্রমপূর্ব্বক সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

২৪। তোমার শত্রু হউন বা মিত্র হউন, কাহাকেও এমন কি তিরস্কারকালেও অশ্লীল বা কর্কশ কথা বলিবে না।

২৫। জ্ঞানদাতা, জন্মদাতা অপেক্ষা অধিক মাননীয়, কিন্তু জন্মদাতা স্বয়ং জ্ঞানদাতা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাস্পদ জানিবে।

২৬। পবিত্র দ্রব্য ভোজন করিবে, ঋতুর উপযোগী পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, পবিত্র স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিবে এবং পবিত্রপ্রকৃতি পুরুষের সহিত প্রণয় করিবে।

২৭। কেহ তোমাকে মধ্যস্থ মানিলে বিচার কালে কাহারও পক্ষপাত করিও না, সত্য ও ধর্ম্মের অনুরোধে নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে।

২৮। কাহারও অনুরোধে কোথাও অধিক এবং লজ্জা বশতঃ কোথাও অল্প পরিমাণে ভোজন করিও না।

২৯। যখন কোন মাননীয় পুরুষ কোন কথা বলিতেছেন, তাহা শুনিবে। তুমি পূর্ব্বে উহা বিদিত থাকিলেও তাঁহার সে কথায় বাধা দিও না। কেননা তুমি জানিলেও অন্য শ্রোতা তাহা নাও জানিতে পারেন, অথবা তুমি যাহা জান, হয়তো তিনি তদপেক্ষা আরও বিচিত্র ব্যাখ্যাও করিতে পারেন।

৩০। যাহারা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া যে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস করে, তাদৃশ অব্যবস্থিতচিত্ত ও ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির সহিত কখনও মিত্রতা করিও না।

৩১। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাবৎ কাল অনুষ্ঠেয় কার্য্যের প্রতি অযত্ন করিও না। এক দিনের সামান্য অযত্নে তোমার বহুদিনের শ্রম ও সঙ্কল্প বিফল হইয়া যাইতে পারে।

৩২। যদি কোন গুরুতর কার্য্যের জন্য কাহারও নিকট সাহায্য পাইবে আশ্বাস পাইয়া থাক, তবে তাহা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। কেননা তোমার বিরুদ্ধবাদিগণ তাহাতে আকস্মিক বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া কার্য্যের ক্ষতি করিতে পারে।

৩৩। যে কার্য্য তোমার বা অন্যের কল্যাণদায়ক, তাহা সাধন করিবার জন্য কালবিলম্ব করিও না। কেননা মন, ধন ও জীবন সমস্তই চঞ্চল। বিলম্ব করিলে কার্য্য সাধনে বিঘ্ন হইতে পারে।

৩৪। যিনি তোমা অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ও মাননীয়, তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস করিও না। যদি তিনি তোমাকে আদর করিয়া কোন প্রকার রহস্য করেন, তুমি রহস্যবাদ সহ তাহার উত্তর দিও না। কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া অবনত মস্তকে তাহা শ্রবণ করিবে মাত্র।

৩৫। যাঁহারা উচ্চ-পদস্থ ও মাননীয়, তাঁহাদের সহিত অল্প কথায় বার্ত্তালাপ করিবে। অনাবশ্যক বা অযথোচিত বার্ত্তা করিবে না।

৩৬। যখন কোন অপরিচিত লোকের সহিত প্রথম আলাপ করিবে, তখন এরূপ প্রসঙ্গ লইয়া

আলোচনা করিতে থাকিবে, যেন তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃতির সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাও।

৩৭। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সমস্ত দিনের কর্ত্তব্য মনন করিয়া লইবে ও রাত্রিতে শয়ন কালে সমস্ত দিন যাহা যাহা করিলে তত্তাবতের সদসৎ প্রকৃতি ও শুভাশুভ ফলের বিচার করিবে।

৩৮। যখন তোমার ধন, বিদ্যা বা জ্ঞানাদির অভিমান উদয় হইবে, তখন তোমা অপেক্ষা ধনী, বিদ্যাবান্ ও জ্ঞানিগণের প্রতিভা স্মরণ করিও, তাহা হইলে তোমার মস্তক আপনিই অবনত হইবে।

৩৯। যখন তুমি অল্লোপার্জ্জন জন্য একাহার ও এক বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত মনে করিবে, তখন ভিক্ষোপজীবী, উচ্ছিষ্টান্ন-ভোজী, ছিন্ন-বসনধারী দরিদ্রদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনার মনকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে।

৪০। তুমি যদি কাহারও উপকার করিয়া থাক, তবে তাহা ভুলিয়া যাও, কিন্তু যিনি তোমার কোনও প্রকার উপকার করিয়াছেন, তাঁহাকে কখনও ভুলিও না। কোন সময় তিনি তোমার অপকার করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিবে।

৪১। ভয় দেখাইয়া সজ্জনকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিও না। তুমি সুযোগ পাইলেই লোকের হিত সাধন করিবে, তাহা হইলে লোকে আপনা আপনিই তোমার বাধ্য হইয়া পড়িবে।

৪২। যদি একজনের সহিত আর এক জনকে কথা বার্ত্তা করিতে দেখ, তন্মধ্যে তোমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে, তুমি সে কথা উত্তমরূপ জানিলেও তাহাদের কথা সমাপ্ত না হইলে তাহার উল্লেখ করিও না।

৪৩। যখন যে স্থানে যে প্রসঙ্গের কথোপকথন হইতে থাকে, তথায় বিনা জিজ্ঞাসায় তাহা অথবা অন্য কোন কথা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিলে মূর্খতা প্রকাশ পায়।

৪৪। যদি কেহ তোমার অপবাদ ঘোষণা করে তাহার প্রতিবাদ করিও না। তোমাকে যখন কেহ সেই প্রসঙ্গের প্রশ্ন করিবে, তখনই কেবল তাহার যথাযথ উত্তর দিবে মাত্র। সহনশীল পুরুষকে ভগবান্ স্বয়ং রক্ষা করেন।

৪৫। একজনকে অপর একজনের সমক্ষে কৌতুকচ্ছলেও লজ্জিত করিও না।

৪৬। যদি কোন ব্যক্তির কোন দোষ দেখিতে পাও, তবে সহসা সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রচার করিও না। সে ব্যক্তি যখন সুস্থচিত্ত থাকিবে, সেই সময়ে তাহাকে নির্জ্জনে তাহার সংশোধনার্থ মিষ্ট ভাষায় সৎপরামর্শ দিবে।

৪৭। যে ব্যক্তি বধির, কুব্জ, জন্মকাল হইতে খঞ্জ, অন্ধ বা চিররোগী, বা কোন প্রকার অঙ্গহীন, চাটুকার ও গৃহভেদী তাহাকে সেবক-রূপে গ্রহণ করিও না।

৪৮। বিনা অনুমতিতে অন্যের শিরোনামাঙ্কিত, পত্র পাঠ করিও না।

৪৯। যখন কোন স্থান হইতে কোন পত্র আসিবে তুমি শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রথমেই পাঠ করিবে, কেননা তাহাতে এরূপ কোন আবশ্যক সমাচার থাকিতে পারে যে, তাহা তোমার তাৎকালিক কার্য্য অপেক্ষাও অতীব গুরুতর।

৫০। যখন কেহ কোন দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহার অনুমতি ভিন্ন তখন তাহার সম্মুখীন হইবে না।

৫১। হস্তীর দন্তের ন্যায় সাধুপুরুষের বাক্য একবার মুখ হইতে নির্গত হইলে আর তাহাকে

ঢাকিবার উপায় থাকে না ; এই জন্য এরূপ কথা কহিবে, যাহা কাহারও কাছে লুকাইতে না হয়।

৫২। প্রত্যেক কার্য্যে অত্যন্ত শীঘ্রতা বা অতীব দীর্ঘসূত্রতা নিতান্ত অহিতজনক। কার্য্যের প্রকৃতি ও তৎ পরিণাম-ফলের দিকে প্রথমে দৃষ্টি করিবে।

৫৩। ক্রোধের উদয় হইলে, তখনই কাহাকেও কোন কথা বলিও না, মৌনী হইয়া থাকিবে ; কেননা সে সময়ে এমন অযোগ্য কথা নির্গত হইতে পারে যে, সেজন্য তোমাকে চিরদিন পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতে হইবে।

৫৪। জগতে সামান্য একটী লাভের জন্য আত্ম-গৌরব বা নিজ মর্য্যাদা কখনও লঙ্ঘন করিও না।

৫৫। তুমি যেখানেই যখন থাক না কেন, বিশেষতঃ যখন তুমি গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন করিবে, তখন স্বসমভিব্যাহারে কিছু অর্থ, একখানি ছুরিকা ও একটী অঙ্গুরীয় রাখিবে। এতদ্দারা অনেক আকস্মিক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ও সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

৫৬। পরোপকারের জন্য অবশ্যই কায়মনোবাক্যে

যত্ন করিবে, কিন্তু এতদ্ব্রতে এতদূর উন্মত্ত হইও না যে, তদ্দারা তুমি স্বয়ং বিনষ্ট বা ভ্রষ্ট হইয়া যাও।

৫৭। স্বদেশের শাসনকর্ত্তা ও শান্তিরক্ষকদিগের সহিত সর্ব্বদা মিত্রতা রাখিবে। বলবান্, ধনবান্, বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মাত্মাদিগের নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না।

৫৮। মাননীয়গণের শুশ্রূষা ও সেবা করিবে, এবং তোমা অপেক্ষা হীনদিগের প্রতি কৃপা করিবে; কাহারও প্রতি অনাস্থা বা ঘৃণা প্রকাশ করিও না।

৫৯। যে তোমার কথায় শ্রদ্ধা করে না, তাহাকে কোন প্রকার সদুপদেশ দিও না, কিন্তু সে কোন বিপদে পড়িয়া ব্যাকুল হইলে, তাহাকে সৎপরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত হইও না।

৬০। মদ্যপানোন্মত্ত, পাগল, মূঢ়তম ব্যক্তি তোমাকে কোন অন্যায় কথা বলিলে, তাহার প্রতিবাদ করিও না।

৬১। বাদ প্রতিবাদ স্থলে কেবল আপনার কথাই উচ্চৈঃস্বরে বার বার বলিও না, প্রতিবাদী যাহা বলিবে, স্থির চিত্তে তাহাতেও প্রণিধান করিবে।

৬২। যাহারা শাস্ত্র শিখিয়া অন্যকে উপদেশ

দিবার সময় বড় পণ্ডিত, কিন্তু স্বয়ং উপদিষ্ট মতের আচরণ না করে, তাহাদিগকে প্রদীপ-হস্ত অন্ধের ন্যায় জানিবে।

৬৩। যে তোমার সম্মুখে অন্যের নিন্দা করে, সে অন্যের সম্মুখে তোমারও নিন্দা করিতে পারে। তাহার নিকট সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে।

৬৪। গৃহস্থাশ্রমে এরূপ ক্ষমাশীল হইও না যে, সকলেই তোমার নিকট নির্ভয় থাকিবে, এবং এরূপ ক্রুদ্ধ ও উদ্ধতও হইও না যে, সকলেই বিরক্ত ও ভীত হইবে।

৬৫। যিনি আপনার জিহ্বাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি শত শত লোককে নিজের আয়ত্ত করিয়াছেন। যিনি আপনার মনকে আপনার বশীভূত করিয়াছেন, ত্রিলোক তাঁহার বশীভূত হইয়াছে।

৬৬। মূর্খতা ও পরাধীনতা সত্ত্বে কখনও আপনাকে সুখী মনে করিও না।

৬৭। যে পুস্তক পাঠ করিলে হৃদয় নির্ম্মল হয়, উৎসাহ ও সৎসাহস বৃদ্ধি হয়, মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বর-জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, লোকোপকারার্থ চিত্তের প্রবৃত্তি ও সত্য-পথে রতি হয়, সেই পুস্তকই পাঠ করিবে।

৬৮। ক্রোধের সময় বিদ্যাবানের, সমরক্ষেত্রে

বীরপুরুষের ও বিপৎকালে মিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

৬৯। যে ব্যক্তি অন্যের অশুভ সংবাদ প্রফুল্ল-হৃদয়ে শ্রবণ করে, তাহাকে নরাধম বলিয়া জানিবে।

৭০। ক্রমাগত এক প্রকার কার্য্য করিও না। মধ্যে মধ্যে কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে। তাহা হইলে কার্য্য-পরিপাটী হইবে, এবং শরীর ও মন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৭১। সকল কথাতেই যে "হাঁ" "হাঁ" করিয়া যায়, ও সকল কথাতেই যে ব্যক্তি সংশয় করে, এতদ্দ্বয়ের কাহারও নিকট মন্ত্রণা গ্রহণ করিও না।

৭২। লোভই বিষম বিপৎপাতের মূল, এবং ক্রূরতাই শত্রুতার ভিত্তিভূমি, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

৭৩। বৃদ্ধের কথায় উপহাস করিও না।

৭৪। যেমন সুন্দর মুখে ধূলি বা কালী মাখাইলে অতি কদর্য্য দেখায়, বিদ্যা বা ধর্ম্ম প্রভৃতির সহিত অভিমান মাখা থাকিলে তদপেক্ষা আরও কদর্য্য দেখায়। গুণবান্! তুমি কখনও নিজ গুণের অভিমান করিও না, তাহাতে তোমার প্রতিষ্ঠার হানি হইবে।

৭৫। যেমন অন্যের গাত্রে চন্দন চর্চ্চা করিয়া দিলে নিজ হস্তও চন্দনের সুগন্ধে আমোদিত হয়, সেইরূপ পরের প্রশংসা বা গুণগান করিলে নিজেও প্রশংসিত ও গুণশালী হওয়া যায়।

৭৬। পথের কাদা উঠাইয়া যদি অন্যের গাত্রে নিক্ষেপ করিতে যাও, তবে তাহা পরের গাত্রে লাগিবার পূর্ব্বেই তোমার নিজ হস্ত যে মলিন করিবে, তাহা নিশ্চয়। সেইরূপ পরের নিন্দা করিতে গেলে প্রথমে নিজের রসনা ও বাসনা মলিন ও নিন্দিত হইয়া থাকে।

৭৭। যাহার সহিত বিশেষ প্রণয় আছে, তাহার নিকট সহসা ঋণ লইও না। অর্থের সম্বন্ধ থাকিলে অনেক স্থলে মনোভঙ্গের বিশেষ কারণ হইয়া উঠে।

৭৮। নীচাশয়ের লক্ষণ এই যে, উচ্চপদ পাইলে অভিমানে ফুলিয়া উঠে ও সেই পদ স্থায়ী হইলে, লোকের প্রতি অত্যাচার করে।

৭৯। অন্যের দুষ্কর্ম্মের পরিণাম ফল দেখিয়া যে আপনি সাবধান হয়, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্।

৮০। অন্যে অপরাধ করিলে তুমি ক্ষমা করিবে, কিন্তু তুমি স্বয়ং অপরাধ করিলে আপনাকে ভর্ৎসনা করিও।

৮১। বিপত্তিকালে অবিচলিত-চিত্ত থাকিবে, এবং বৃদ্ধ ও বহুদর্শী লোকের নিকট উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিবে।

৮২। যদি কোন নিন্দিত স্থানে তোমার পরিচিত কোন ভদ্র লোককে দেখিতে পাও, অথবা যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কোন সামান্য কার্য্য করিতে দেখ, তবে সে সময়ে তাঁহাকে ডাকিও না, বরং যাহাতে তিনি তোমাকে দেখিতে না পান, এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে চলিয়া যাইবে, কেননা তিনি লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইবেন।

৮৩। যদি কোন উদার-চিত্ত মহাত্মা তোমার কোন কার্য্যের দোষে তোমার উপর অভিমান করিয়া থাকেন, তবে সুমধুর ও বিনয়বিনম্র বচনে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিও, তাহাতেই তিনি শান্ত হইবেন। দুগ্ধ উথলিয়া উঠিলে একটু শীতল জল নিক্ষেপ-মাত্রই তাহা উপশম প্রাপ্ত হয়।

৮৪। যেখানে প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত, সেখানে বায়ু তদুদ্দীপনে সহায়তা করে, আর প্রদীপ-শিখাকে দুর্ব্বল দেখিয়া বায়ু তাহাকে নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। তুমি বায়ুর অনুকরণ করিও না, তুমি কায়মনোবাক্যে দুর্ব্বলের বল বিধান করিবে।

৮৫। যেমন হংস ও বক দুইই শুক্লবর্ণ, কিন্তু যখন জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়, তখনই উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ মূর্খ ও গুণী চিনিতে হইলে দেখিবে, যিনি লোকের দোষ ছাড়িয়া গুণ গ্রহণ করেন, তিনিই গুণী, ও যে লোকের দোষানুসন্ধান করে, সে লেখাপড়া জানিলেও মূর্খ।

৮৬। যেখানে গেলে, ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, সে স্থান ভিন্ন, বিনা আমন্ত্রণে কোন বড় লোকের নিকট যাইও না। তাহাতে তোমার গৌরব-হানি ও মন নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবে।

৮৭। লোককে শিখাইবার জন্য যত যত্ন করিবে, নিজে শিখিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক যত্ন করিবে।

৮৮। সূর্য্য থাকিতে যতদিন চন্দ্র (দিবাভাগে) প্রকাশিত থাকেন, তন্মধ্যে কোন দিনই তিনি সম্পূর্ণ কলা সহ উদিত হইতে পারেন না। তোমা অপেক্ষাও মহাতেজা পুরুষ যেখানে থাকিবেন, যদি মর্য্যাদা চাও, তবে সেখানে থাকিলে, তোমার প্রতিভা ও বলের স্বতন্ত্র প্রকাশ থাকিবে না, ইহা মনে রাখিও।

৮৯। কোন পুষ্প বা ফল আদি দ্রব্য পাইলে

(যদি তাহার গুণ বিদিত না থাক) তবে সহসা তাহার আঘ্রাণ বা আস্বাদ গ্রহণ করিও না।

৯০। সাধ করিয়া বা গৃহ শোভার জন্য কখনও কোন পক্ষী আদি কোন জীবকে পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিও না।

৯১। যতক্ষণ যে সামগ্রী তোমার নিকট আছে ততক্ষণ উহা পরের হইলেও তোমার কার্য্যে লাগিতে পারে। আর আপনার দ্রব্য পরের কাছে থাকিলে তোমার কার্য্য কালেও হয়তো তাহা পাইতে না পার, অথবা তদ্দারা তোমার হানি হইতে পারে। তোমারই অস্ত্র অন্যের হস্তে গিয়া হয় তো তোমারই মস্তক ছেদন করিতে পারে। *

* "তোমার কার্য্যে লাগিতে পারে" এবং "তুমি ব্যবহার করিতে পার" এই দুইটি বাক্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। কবিগণ ভাষার রস বুঝিয়া শব্দ ব্যবহার করেন। শব্দের ধাত্বর্থ, ভাবার্থ ও লক্ষ্যার্থ এক হইবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণতঃ একটী কথা শুনিবা মাত্রই ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতার মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়। সুচতুর ব্যক্তি ভিন্ন বক্তার লক্ষ্য অনেকেরই বোধগম্য হয় না। স্থান বিশেষে শব্দ বিশেষের প্রয়োগ দ্বারা বক্তা নিজের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। "নরেশ" "ক্ষিতীশ" দুটী শব্দই

৯২। যে সম্ভ্রান্ত কুলে জন্মে, সেই ভাল হইবে, ও নীচ কুলে জন্মিলেই যে সে মন্দ হইবে তাহা নহে, কেননা উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা হইতেও কজ্জল এবং কদর্য্য পঙ্ক হইতেও সুগন্ধি কমল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রাজাকে বুঝায়, কিন্তু দুটী এক লক্ষ্যার্থের সাধক নহে। "পাদপ" ও "শাখী" উভয়ই বৃক্ষবাচক শব্দ, কিন্তু এক লক্ষ্যার্থের সাধক নহে। "কৃষ্ণ" ও "রাধানাথ" উভয়ই যশোদানন্দনের নাম; কিন্তু বেদব্যাস বর্ণনাকালে কৃষ্ণ শব্দপ্রয়োগ দ্বারা যে স্থানে যে লক্ষ্য সাধন করিয়াছেন, যদি কেহ সেই স্থানে "রাধানাথ" শব্দ প্রয়োগ করেন, তবে সেই শ্লোকের সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। "কার্য্যে লাগা"ও "ব্যবহার করা" সাধারণতঃ এক বোধ হইলেও লক্ষ্যার্থে অত্যন্ত বিভিন্ন। কোন দ্রব্য বিশেষের অভাব এবং সেই অভাব জন্য ক্লেশ অথবা প্রকৃত ক্ষতি বোধ হইলে যদি কোন দ্রব্য সেই সময় অকস্মাৎ আমার হস্তগত হইয়া আমার সহায়তা করে, তখন সেই দ্রব্য আমার "কার্য্যে লাগিল" বলিতে হইবে। আর যদি কোন দ্রব্য আমার তত্ত্বাবধানে থাকে এবং আমার কার্য্য সাধনার্থ আমাকে প্রভু মনে করিয়া তদ্দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করি, তবে সেই দ্রব্য আমি "ব্যবহার করিলাম" বলিতে হইবে। প্রথমটীতে দ্রব্যটী আমার সাধক, সহায়ক ও উপকারক, দ্বিতীয়টীতে দ্রব্যটী আমার অধিকৃত, অধীন ও সহায়ীভূত। প্রথমটীতে দ্রব্যের প্রভুত্ব, দ্বিতীয়টীতে দ্রব্যের সেবকত্ব। প্রথমটীতে দ্রব্যটী নিমিত্ত কারণ।

৯৩। তোমা অপেক্ষা বিদ্যাবান্ ও বুদ্ধিমান্ বিধর্ম্মীর সহিত তর্ক বিতর্ক করিও না।

৯৪। যে তোমার বিরোধী, সে ক্ষুদ্র হইলেও

দ্বিতীয়টীতে দ্রব্যটী উপাদান কারণ। প্রথমটীতে দ্রব্য কর্ত্তা, দ্বিতীয়টীতে দ্রব্য কর্ম্ম। প্রথমটীতে আমি সাহায্য-প্রাপ্ত, দ্বিতীয়টীতে আমি স্বয়ং বিধাতা ও কার্য্যের মূল। সুতরাং দ্বিতীয়টীতে আমি দোষ-ভাগী। মনে করুন, আপনার ছড়ি গাছটী আমাকে রাখিতে দিয়াছেন। অকস্মাৎ যদি একটা ক্ষিপ্ত কুকুর আমাকে কামড়াইতে আসে, আমি ঐ ছড়ির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিলাম। এই সময় আপনার ছড়ি গাছটী আমার কাজে লাগিল। কিন্তু যদি প্রত্যহ বেড়াইবার সময় ঐ ছড়ি গাছটী লইয়া বেড়াইতে যাই, তাহা হইলে উহা আমার "কাযে লাগিতেছে" বলিব না, কিন্তু "ব্যবহার করিতেছি" বলিতে হইবে। আপদে, অসময়ে যে দ্রব্যের সহায়তা পাওয়া যায়, তাহারই নাম "কাযে লাগা।" একটী কথার ভাব অনেক প্রকার হইতে পারে। পাছে পাঠকের ভাবের ব্যভিচার বুদ্ধি হয়, এই জন্য লক্ষ্যার্থের পোষক একটী দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা "তোমারই অস্ত্র অন্যের হস্তে গিয়া হয়তো তোমারই মস্তক ছেদন করিতে পারে।" অতএব অবস্থা বিশেষ, সময় বিশেষ ও কার্য্য বিশেষ ব্যতীত দ্রব্য ব্যবহার মাত্রকেই "কাযে লাগা" বলা যায় না। যাহা অসময়ে উপকার করে তাহাই "কাযে লাগে।" অন্যের দ্রব্য যদি কার্য্যে "লাগে" তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু অন্যের দ্রব্য কার্য্যে "লাগাইলে" অত্যন্ত অপরাধ হয়, সন্দেহ নাই।

তাহার নিকট সতর্ক থাকিবে, কেননা কণা মাত্র অগ্নিও বৃহৎ কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করিতে পারে।

৯৫। নিজ কৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন দ্বারা তাহা অপসারিত হইতে পারে না। অগাধ জলরাশিপূর্ণ মহাসমুদ্র যাহার পিতা, সেই চন্দ্রের কলঙ্ক-চিহ্ন বিধৌত হইল না।

৯৬। যে স্বয়ং দোষী সে অন্যের দোষই কেবল অনুসন্ধান করে, যিনি সাধু তিনি অন্যের দোষ দেখিলেও তাহা প্রকাশ করেন না, বরং তাহা গোপন করেন। সূচী স্বয়ং ছিদ্রযুক্ত, এ জন্য বস্ত্রের ছিদ্র-দ্বার দিয়া গমন করে, কিন্তু তৎপশ্চাৎ সূত্র সাধুর ন্যায় সূচী-কৃত ছিদ্র ও অন্য বৃহৎ ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেয়।

৯৭। যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে দেখ, তবে অধিক-ক্ষণ বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বা আলাপ করিও না। হয়তো তাহাতে তাঁহার বিশেষ আবশ্যক কার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে।

৯৮। চরণদ্বয় সর্ব্বদা উষ্ণ, মস্তিষ্ক শীতল ও উদর নির্ম্মল রাখিবে, তাহা হইলে শরীর অসুস্থ হইবে না।

৯৯। অনেক কালের মিত্রকে একটী সামান্য দোষে অকস্মাৎ ত্যাগ করিও না।

১০০। যদি কোন গুরুতর কার্য্যের সাধনার্থ প্রবৃত্ত হও, তবে ধর্ম্মের উপাদানে তাহার ভিত্তি স্থাপন করিও।

১০১। যদি দেবতুল্য পরাক্রমী ও নীরোগ হইতে চাও, তবে জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী হইতে শিক্ষা কর।

১০২। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পেতেও পার, লুকানো রতন।"

১০৩। যিনি সর্ব্ব সাধারণের হিতার্থে সমাজের কোন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার নিন্দাবাদ ঘোষণা করিও না।

১০৪। যাঁহার কাছে তুমি কখনও কোন উপকার পাইয়াছ, তিনি যদি অবস্থা দোষে তোমার শত্রু হইয়া উঠেন, তথাচ লোকের কাছে তৎকৃত পূর্ব্ব উপকারের জন্য তাঁহার প্রশংসা করিও, তাঁহার শত্রুতার কথা উল্লেখ করিও না। দেখিবে, তিনি আপনিই পুনর্ব্বার তোমার মিত্র হইবেন।

১০৫। তিনিই যথার্থ কর্ম্মে ব্যস্ত, যাঁহার পরনিন্দা করিবার বা শুনিবার অবকাশ নাই।

১০৬। স্পর্শমণি ও ভগবদ্ভক্ত এতদ্দ্বয়ে অতিশয় পার্থক্য। স্পর্শমণি লৌহকে কাঞ্চন করিতে পারে বটে, কিন্তু আপনার সমান স্পর্শমণি করিতে পারে না, আর ভগবদ্ভক্তের কৃপা হইলে অতি দুরাত্মাও ভগবদ্ভক্ত হইয়া থাকে।

১০৭। সূচী (ছুঁচ) স্পর্শমণি-স্পর্শে স্বর্ণময় হয় বটে, কিন্তু অন্য দেহ বিদ্ধ করিবার তীক্ষ্ণাগ্রতা ত্যাগ করে না, তদ্রূপ খল-স্বভাব ব্যক্তি লিখিয়া পড়িয়া পণ্ডিত হইলেও আপনার দুষ্ট স্বভাব ছাড়ে না।

১০৮। চুম্বকে ঘর্ষণ করিলে লৌহ চুম্বকের শক্তি লাভ করে, কিন্তু কাষ্ঠ ঘৃষ্ট হইলে উহা কখনই চুম্বকের শক্তি প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ জন্মতঃ যাঁহার প্রকৃতি সাধু, সেই ব্যক্তিই শিক্ষাগুণে মহাপুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু খল-প্রকৃতিকে যত উপদেশই দাও না কেন, তাহার মৌলিকত্ব বিদূরিত হয় না।

১০৯। সর্পকে বিশ্রামের জন্য প্রশস্ত শয্যা দিলেও সে লাঙ্গুল বিস্তার না করিয়া কুণ্ডলীকৃত হইয়াই শুইবে, সরল পথ দেখাইয়া দিলেও সে বক্রগতিতে যাইবে, তাহাকে দুগ্ধ রম্ভা খাওয়াইলেও সে গরল উদ্গিরণ করিবে। তদ্রূপ খলের প্রতি শিষ্টাচার করিলেও,

তাহাকে সৎপরামর্শ দিলেও, তাহাকে প্রীতি করিলেও সে তাহার স্বভাব ছাড়িতে পারে না। খল হইতে দূরেই থাকিবে।

১১০। চন্দন তরুকে ছেদন করিলেও সে সুগন্ধ দানে বিরত হয় না, ইক্ষুকে নিষ্পেষণ করিলেও সে সুরস দিয়া থাকে, জলকে পদাঘাত করিলেও সে শীতলতা দান করে, সেইরূপ সাধুব্যক্তি নিন্দিত ও নির্যাতিত হইলেও তিনি পরহিত সাধনে বিমুখ হয়েন না।

১১১। যেমন একটী শাদা কাচের শিশির ভিতর কৃষ্ণবর্ণ কোন তরল পদার্থ ভরা থাকিলে তাহার বহির্ভাগ যতই জল দ্বারা ধৌত ও মৃত্তিকা দ্বারা মার্জ্জিত কর না কেন, শিশিটির শুভ্রতা কিছুতেই লক্ষিত হয় না, সেইরূপ যে দুষ্ট ব্যক্তির অন্তঃকরণ মলিন ভাবের দ্বারা কলুষিত, সে দিবারাত্রি শরীরে মৃত্তিকা লেপন ও শতবার স্নান করিলেও শুচি হয় না।

১১২। যেমন মলিন বস্ত্রে যে কোন রংই লাগাও না কেন, তাহাতে যেমন রং ধরে না, সেইরূপ যাহার হস্ত পদাদি অসংযত ও মন কলুষিত, সে তীর্থযাত্রাই

করুক বা ধর্ম্ম-কাহিনীই শ্রবণ করুক, কিছুতেই তাহার সম্যক্ ফল হয় না।

১১৩। যিনি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রও পাঠ করিয়াছেন তিনিই পণ্ডিত নহেন, কিন্তু যিনি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভগবান্‌কে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত।

১১৪। যদি অন্যের দোষ সংশোধন করিতে চাও, তবে বিনীত দাসের ন্যায় মৃদুস্বরে তাহার নিকট তাহার দোষ কীর্ত্তন করিও ; জ্বলন্ত জ্বালামালা-পূর্ণ শাসন বাক্যে কাহাকেও উপদেশ দান করিও না।

১১৫। যিনি সদা আনন্দযুক্ত ও প্রফুল্ল-মুখ থাকেন, তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি আছে জানিবে।

১১৬। যতগুলি কার্য্যকেই মনুষ্য মন্দ বলে, ঈশ্বরের সম্মুখে তাহার সকল গুলিই "মন্দ" নহে, এবং যতগুলি অনুষ্ঠানকেই মনুষ্য "পুণ্য" বলিয়া স্থির করে, তাহারও অনেকগুলি ঈশ্বরের চক্ষে অন্যায় বলিয়া প্রতীত হয়।

১১৭। ভগবান্‌কে ভয় ও ভক্তি কর, তাহা হইলে জগতের আর কাহাকেও, এমন কি মৃত্যুকেও, ভয় করিতে হইবে না।

১১৮। ভগবান্‌কে প্রীতি কর, তুমি সকলের প্রিয় হইয়া উঠিবে।

১১৯। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে বিশ্বাস কর, যেখানে তোমার বিপদ্ হউক না কেন, সেখানেই তাঁহাকে রক্ষক দেখিতে পাইবে।

১২০। যিনি তোমাকে দিবারাত্রির মধ্যে এক বারও বিস্মৃত হয়েন না, তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য? যিনি সদাই তোমার কল্যাণ সাধন করেন, তাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?

১২১। তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা তত সুন্দর নহে, কিন্তু যাহা দেখিতে হইলে দর্শন-শক্তি স্তম্ভিত ও বিমোহিত হইয়া যায়, তাহাই পরম সুন্দর।

১২২। যদি তুমি আপনাকে মহান্ হইতেও মহীয়ান্ পরমেশ্বরের সেবক বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে আর আপনাকে নীচ বোধ হইবে না।

১২৩। সাধারণ লোকের কথায় কোন কার্য্য ভাল কি মন্দ তাহা স্থির করিও না। নিজ বুদ্ধি, গুরু-বাক্য, শাস্ত্রের উপদেশ ও প্রবীণ মহাত্মাদিগের কথা একত্র মিলাইয়া সিদ্ধান্ত করিবে।

১২৪। যদি সুখী হইতে চাও, তবে আত্মাকে ভগবৎ-প্রেমামৃত পানে সদা সচেতন রাখ।

১২৫। যদি কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা আদি দূর করিতে চাও, তবে ভগবানের কাছে অনাথের ন্যায় শরণাগত হও, তাঁহার ভয়ে দুষ্টগণ পলায়ন করিবে।

১২৬। যেমন নদী পার হইতে হইলে নাবিকেরই ভরসা করিয়া থাক, তদ্রূপ অজ্ঞান-সমুদ্র পার হইতে হইলে ভব-কর্ণধার ভগবানেরই কেবল ভরসা করিবে।

১২৭। তুমি যদি এরূপ ইচ্ছা কর যে, তুমি যাহা বলিবে তাহা সকলেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে, তবে অগ্রে তুমি সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরে নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর।

১২৮। যাহা ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত, তাহারই অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমাকে বাধা দিলে বা নিন্দা করিলে তোমার ভয় বা ক্লেশ হইবে না।

১২৯। নিজের দর্পণে বা লোকের চক্ষে সুন্দর হইলে কি হইবে? যাহাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তোমার আত্মাতে পড়িতে পারে, এরূপ সুন্দর ও স্বচ্ছ হইতে চেষ্টা কর।

১৩০। নিজের চক্ষে ও ঈশ্বরের চক্ষে যখন তুমি নিষ্পাপ হইবে, তখন লোকে তোমাকে শতাপরাধী বলিলেও দৃক্‌পাত করিও না।

১৩১। আপনার কর্ম্মকেই আপনার নির্দ্দোষিতার সাক্ষী মানিবে। মনুষ্য-সাক্ষী ও মনুষ্য-রাজার কাছে আপনার সাধুতার বিচার-প্রার্থী হইও না।

১৩২। মহতের ভিন্ন নীচের সেবা কখনই করিও না। উভয়ের সেবাতেই সমান পরিশ্রম, কিন্তু ফল দানে উভয়ে সমান সমর্থ নহে। সমুদ্রের সেবা করিলে, রত্ন এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ের সেবা করিলে শম্বুক ও ভেক লাভ হইয়া থাকে।

১৩৩। সদা ভক্তজনের সহিত বাস করিও, কিন্তু নাস্তিকের সহবাস প্রাণান্তেও স্বীকার করিও না। কেননা গন্ধবণিকের (ভক্তের) দোকানে বসিয়া থাকিলে নানা দ্রব্যের সৌগন্ধে তোমার চিত্ত পুলকিত হইবে এবং কর্ম্মকারের (নাস্তিকের) কার্য্য-শালায় বসিলে তোমার অঙ্গে মলিন অঙ্গার-কণা, জ্বলদঙ্গার-স্ফুলিঙ্গ ও উত্তপ্ত লৌহ-কণিকা ছিট্‌কাইয়া লাগিবে।

১৩৪। শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে সামান্য মনে

করিও না। কেননা একটী কণা-মাত্র অগ্নিও রাশি রাশি তৃণ অনায়াসে বিদগ্ধ করিতে পারে।

১৩৫। মূর্খের নিকট তোমার গুণের মর্য্যাদা আশা করিও না; মূর্খ গুণের গৌরব জানে না। বন্ধ্যা কি কখনও প্রসূতির বেদনা বুঝিতে পারে?

১৩৬। সন্ন্যাসী, গুরু বা সম্মানিত ব্যক্তিগণ যে আসনে উপবেশন বা শয়ন করেন, তাহাতে কখনও উপবেশন বা শয়ন করিবে না।

১৩৭। স্ত্রীলোক মাত্রকেই মাতা বা ভগিনী-তুল্য ভাবিয়া ভক্তি বা স্নেহ করিবে।

১৩৮। সাধু কার্য্য সাধন করিবার জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করিও না। সাধু উপায়ে সৎকার্য্য সাধন করিবে।

১৩৯। তোমার প্রিয় ব্যক্তির যাহা প্রয়োজন, তোমার সামর্থ্য থাকিলে তাহা তিনি তোমার নিকট চাহিবার পূর্ব্বেই প্রদান করিবে।

১৪০। প্রিয় ব্যক্তির শ্রেয়ঃ বা প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইলে তাহা প্রিয় ভাবে সম্পাদন করিবে। বল-প্রকাশ, নির্য্যাতন, তিরস্কারাদি রূপ অপ্রিয় উপায়

দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির প্রেয়ঃ বা শ্রেয়ঃ সাধন করা ভাল নহে।

৩৪১। পাপী বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না, তাহাকে অন্ধের ন্যায় পথভ্রান্ত জানিয়া দয়াদৃষ্টি করিবে ও বন্ধু-ভাবে ধর্ম্মের সুপথ দেখাইয়া দিবে।

১৪২। বিপদে ও সম্পদে ভগবান্‌কে ভুলিও না। সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিবে ও তদর্থে কার্য্য করিবে।

সঙ্কেত।

১। একজন কৃপণ ঘর বাড়ী সমস্ত বিক্রয় করিয়া কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাইল। সেই গুলির প্রতি তাহার এত মমতা বাড়িল যে, সেগুলি ভাঙ্গাইতে বা ব্যয় করিতে না পারিয়া ভূমি মধ্যে পুঁতিয়া রাখিল, এবং প্রত্যহ ভূমি খনন করিয়া এক একবার সেইগুলি দেখিয়া আসিত। একজন চতুর পুরুষ উহা জানিতে পারিয়া মুদ্রাগুলি একদিন গোপনে উঠাইয়া লইয়া গেল। তৎপর দিন কৃপণ ব্যক্তি ভূমি খনন করিয়া যখন দেখিল তাহার ধন নাই, তখন সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন সেই

অপহারক ব্যক্তি আসিয়া এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, তুমি যখন উহা ব্যয় করিবে না, তখন ঐ স্থানে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর রাখিয়া মনে মনে ভাব, ইহাই আমার সুবর্ণ-স্তূপ।

"লেয়্ ন খরচে শুদ্ধ মন; চোর সব হি লে যায়।
পীছে যো মধুমক্ষিকা, হাঁথ মলে পছতায়।"

মধুমক্ষিকা মধুচক্র রচনা করিয়া মধু নিজেও সেবন করে না এবং শুদ্ধমনে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কাহাকে দানও করে না, কিন্তু অন্যে যখন তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়, তখন মক্ষিকা পশ্চাত্তাপ করিয়া হস্ত মর্দ্দন পূর্ব্বক হায় হায় করিতে থাকে। সেইরূপ যে ব্যক্তি ধন আহরণ করিয়া শুদ্ধচিত্তে ব্যয় না করে, তাহার ধন নিশ্চয়ই অন্যের ভোগ্য হয়।

যাহা উত্তম পাইবে বা শিখিবে, তাহা অবশ্যই অন্যকে দান করিবে ও শিখাইবে। নতুবা তোমার বিদ্যা, তোমার গুণ, তোমার জ্ঞানে ফল কি?

২। একটী কৃষকের উদ্যানে একটী আম্রবৃক্ষ ছিল। উহার ফল প্রচুর ও অতি মধুর হইত। কৃষক প্রতি বর্ষে এই বৃক্ষের কতকগুলি সুমিষ্ট আম্র নিজ ভুস্বামীকে উপহার দিত। ভূস্বামী ভাবিলেন, বর্ষে

বর্ষে এই উপাদেয় ফল কয়েকটী মাত্র উপহার পাই, বৃক্ষটী নিজ অধিকারে থাকিলে বহুল ফল পাইবার আশা আছে। অতএব বৃক্ষটী সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া নিজ উদ্যানে রোপণ করিলেন। বৃক্ষটী তথায় শুকাইয়া গেল। ভূস্বামী ফল ও বৃক্ষ উভয় হইতেই বঞ্চিত হইলেন।

"কেঁ্যা কীজে ঐসো যতন, জাতে কাজ ন হোয়।
পরবত পর খোদে কুঁআঁ, কৈসে নিকৃলে তোয়?॥"

এমন প্রযত্ন কেন কর, যাহাতে কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না? পর্ব্বতের উপর কূপ খনন করিলে জল কিরূপে নির্গত হইবে?

অল্প পাইয়া লোভ-পরবশ চিত্তে অধিক লাভের জন্য দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইও না, তাহাতে সমূলে বঞ্চিত হইবে।

৩। কোকিল অণ্ড প্রসব করে, কিন্তু স্বয়ং পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক তাপ দিয়া শাবক উৎপাদন করিতে পারে না, তাই কাক যে বাসায় অণ্ড প্রসব করে, কোকিল গোপনে নিজ অণ্ডকে কাকের অণ্ডের সহিত মিশাইয়া রাখিয়া আসে; কাক আপনার ও কোকিলের অণ্ডের বিভিন্নতা বুঝিতে না পারায় সকলগুলিই

তাহার নিজ অণ্ড মনে করিয়া সকলগুলিকেই স্নেহ সহ তাপ দান করে। যথাকালে অণ্ড বিদারণ পূর্ব্বক শাবকগণ নিষ্ক্রান্ত হইলে, কাক সযত্নে সকল শাবককেই আহার দান করিয়া পোষণ করে। কোকিল সর্ব্বদাই সতর্কভাবে সেই বৃক্ষের কোন এক শাখায় বসিয়া নিজ শাবকের সন্ধান লয় ও প্রেমের স্বরে নিজের ডাক ডাকিতে থাকে। অণ্ড-প্রসূত কোকিল শাবক নিজ-প্রকৃতি-সুলভ ডাক শুনিতে শুনিতে যখনই উড়িবার সামর্থ্য জন্মে, তখনই কোকিলের সহিত উড়িয়া যায়। কাক তদ্দর্শনে পরিতাপ ও হাহাকার করিতে থাকে। এইরূপ, সুসংস্কারযুক্ত যোগী ও ভক্তগণ গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত পালিত হন, কিন্তু যখনই সদ্ভক্ত ও সদ্‌গুরুর মুখে সাধন-বাণী শ্রবণ করেন তখনই গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান। পিতা মাতা সন্তানের স্নেহ মমতা বশতঃ রোদন করিতে থাকেন; কিন্তু পূর্ব্ব সাধন সংস্কার বশতঃ সন্ন্যাসী সৎপুরুষ সেবায় কৃতার্থতা লাভ করেন।

৪। দুগ্ধ একদিনেই বিরস, দুর্গন্ধ ও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে, এবং উহার মধ্যে যে মাখন থাকে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উহাকে সম্থনপূর্ব্বক

মাখন বাহির করতঃ তাহাকে ঘৃত করিয়া রাখিতে পারিলে আর কোনও ভাবনা থাকে না ; উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারের যোগ্য থাকে। ঘৃত আবার পুরাতন হইলে আরও মূল্যবান্ ও উপকারী হয়। এইরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি (দুগ্ধ) শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু-যাতনা ভোগ করে, ও দেহান্তর্গত জীবাত্মাও (মাখন) মলিন ও নিরয়গামী হয় ; কিন্তু সদ্‌গুরু-প্রসাদে দেহ (দুগ্ধ) হইতে আত্মাকে (মাখন) স্বতন্ত্র অনুভব করিয়া "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (ঘৃত) এইরূপ জ্ঞান লাভ করিলে জীব নানা যন্ত্রণাময় সংসার-পাশ হইতে বিমুক্ত হন। পরিশেষে "পুরাণ পুরুষ" ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৫। এক একটি মনুষ্য এক একখানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, জন্ম-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ইহার সূচীপত্র, দীক্ষা-গ্রহণ ইহার উৎসর্গ-পত্র, শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি ইহার এক একটি পরিচ্ছেদ, জীবনের ভালমন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র, সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে, তাহারা যেন শাদা-মলাট-মোড়া সামান্য পুস্তক। যাঁহারা ধনাঢ্য রাজা বা মহারাজ, তাঁহারা

যেন ভাল বাঁধাই করা সোণার জলের কাজ করা মলাট মোড়া এক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোন কার্য্য না করিয়াই তনু ত্যাগ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক। যাঁহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়াও লোক-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াও সারগর্ভ ও মূল্যবান্। যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া সুমহৎ কার্য্য-রাশির অনুষ্ঠান করিয়া যান, তাঁহারাই সুবৃহৎ গ্রন্থ, এবং জগতের সকলেরই পাঠ্য। যাঁহারা অন্যের জীবন গঠন করিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন, অথচ নিজ জীবনে কোন বিশেষ কার্য্য করেন না, তাঁহারা "ব্যাকরণ"। যাঁহারা রাজা মহারাজাদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়া সভাও সমাজ গরম করিয়া রাখেন, তাঁহারা "ইতিহাস"। যাঁহারা জগতের লৌকিক হানি লাভ বিচার করিতে করিতে দিন কাটাইরা থাকেন, তাঁহারা "গণিত" গ্রন্থ। যাঁহারা জড় জগতের চেষ্টা-চরিত্র চিন্তা করাই পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা "ভূগোল"। যাঁহারা কেবল রঙ্গ, রস, আমোদ, প্রমোদ, বিলাসই জীবনের সার করিয়াছেন, তাঁহারা "নাটক"। যাঁহারা পরোপকার,

সত্য, দয়া, নিষ্ঠাদির দ্বারা অলঙ্কৃত, তাঁহারা “ধর্ম্মশাস্ত্র”। যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ভক্তিসহ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা “যোগশাস্ত্র”। এইরূপ মনুষ্য-মাত্রে প্রত্যেকেই এক একখানি গ্রন্থ-বিশেষ। যাহাতে আপনার জীবন-গ্রন্থ পরিপাটীরূপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি বিদ্বদ্গণের পাঠ্য হও, যাহাতে তোমার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সারগর্ভ বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে, যাহাতে তোমার মূল্য অধিক হয়, তোমার মৃত্যু হইলেও তোমার জীবন-চরিত অন্য-জীবনে পুনর্ম্মুদ্রিত হইতে পারে, যাহাতে তোমার মূল গ্রন্থের সহস্র সহস্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তুমি সেইরূপে আপনার জীবন-গ্রন্থ রচনা কর। লিপিদোষ বা ভাবদোষ, সাধু, সজ্জন, বা শাস্ত্রীয় আজ্ঞার দ্বারা সংশোধন করিয়া লও। মনুষ্য-জীবনে যে পাপাদি দেখিতে পাও তাহা মুদ্রাঙ্কনের দোষ জানিবে, উহা পশ্চাত্তাপ বা প্রায়শ্চিত্ত রূপ সংস্কার-পত্রে সংশোধিত করিয়া লইবে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেমন পুস্তকই রচিত হউক না কেন, সকল পুস্তকের শেষেই “সমাপ্তোহয়ম্” (মৃত্যু) লিখিত আছে এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া চলিও। যেন আলস্য,

ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিয়া পুস্তক অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া যাইও না। মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া যতটুকু পবিত্র শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছ, যত্নসহকারে তাহার কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া যাও। বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

চারু চিন্তাবলী।

১। যিনি আপনাকে বিশ্ব-নিয়ন্তার সেবক মনে করিয়া স্বকীয় ও পরকীয় উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ হয়েন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার সহায়; উন্নতি তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ কার্য্যক্ষেত্রে আধিপত্য করে। পরশ্রীকাতর ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্যগণ সেই মহাত্মার বৃথা অপযশ সহস্র কণ্ঠে কীর্ত্তন করিলেও তাঁহার ক্ষতি নাই। ভগবান্ নিজ মঙ্গল-হস্তে বিজয় পতাকা ধারণ করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

২। যদি চিরজীবী হইতে চাও, তবে মৃত্যু হইবার পূর্ব্বেই মরিয়া যাও। কিরূপে মরিতে হয়, তাহা ঐ সমাধিস্থ মৌনী যোগীকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি নীরব থাকিয়াও স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিবেন। তিনিই মরিয়াছেন, যাঁহাকে আর মরিতে হইবে না।

৩। বিহঙ্গ, তুমি যখন দেবদুর্ল্লভ অমৃতমাখা মধুর স্বরে গাহিতে গাহিতে ঊর্দ্ধ আকাশে উড়িতেছিলে, তখন আমি অবাক্ হইয়া তোমার দিকে তাকাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি পুনর্ব্বার অবনীতে অবতরণ করিয়া তণ্ডুল-কণা ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছ দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি তোমাকে পুনরাকর্ষণ করিয়াছে। বিহঙ্গ! এবার তুমি এরূপ বেগে ও এত ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইবে, যেন সংসার তোমাকে আর ধৃত করিতে না পারে।

৪। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দান করিবার সময় "আমি দান করিতেছি" এরূপ অহঙ্কার করিবে না, এবং যাহা কিছু দান করিবে, তাহা যেন আর কেহ জানিতে না পারে। শাস্ত্রের এই গূঢ় কথার গুরু উদ্দেশ্য চিন্তা করিলাম। সিদ্ধান্ত এই হইল যে, যে বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই, সে তাহাকে "আমার" বলিতে অথবা কাহাকেও দান করিতে পারে না। সংসারে আসিয়া আমি যাহা কিছু ভোগ করি, তত্তাবৎই ঈশ্বরের। এখানে আসিবার সময় বা এখান হইতে যাইবার সময় কিছু মাত্রও আনিতে বা লইয়া যাইতে পারি না। তাঁহার বস্তু তাঁহাকে সমর্পণ

(ধর্ম্মার্থ দান) করিব মাত্র। যখন আমার দ্রব্য কিছুই দিলাম না, তখন "আমি" দান করিতেছি এরূপ ভাব অতীব অন্যায়। তিনি আমাকে দেহ, প্রাণ, মন, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনাদি কত শত দ্রব্য ভোগ করিতে দিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে আমার ভোগ্য বস্তুর সামান্যাংশ মাত্র সমর্পণ করিয়া থাকি। তাঁহার সমস্ত দ্রব্য যখন সম্পূর্ণরূপে দিতে পারিলাম না, তখন অনন্যোপায় হইয়া লজ্জাবনত চিত্তে নিজ ক্রটী স্বীকারপূর্ব্বক করযোড়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গোপনে দান করাই শ্রেয়ঃ, কেননা অন্যে জানিতে পারিলে আমাকে চৌর, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণা করিবে।

৫। ইক্ষুকে নিষ্পেষণ করায় মধুর রস নির্গত হইল, রসও অত্যুষ্ণ সন্তাপ সহ্য করিল বলিয়া গুড় হইয়া অপেক্ষাকৃত সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। গুড় দুঃসহ নিপীড়নে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ খাঁড় হইয়া দাঁড়াইল। তৎপরে বিহিত বিধানে সংশোধিত হইয়া শুভ্র, নির্ম্মল ও অতি মধুর চিনি প্রস্তুত হইল।

সাধক, তুমি ইক্ষুর ন্যায় যদি ধর্ম্মের জন্য নির্যাতনগ্রস্ত হও, তাহা হইলে রসস্বরূপ নারায়ণের

কৃপা লাভ করিতে পারিবে। অতঃপর তপস্তাপে তাঁহাকে চিদ্‌ঘনানন্দ স্বরূপ অনুভব করিবে, তদনন্তর সমাধি-সাধন দ্বারা তোমার প্রাকৃতিক ভাব বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলে আত্মসত্তার উপলব্ধি হইবে, অবশেষে তুর্য্যাবস্থায় নির্ম্মল ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব লাভ করিবে।

৬। যদি তুমি কাহারও গুণ গান করিতে না পার, তবে কেবল পরকুৎসা কীর্ত্তনে রসনাকে অপবিত্র করিও না। যদি কখনও কাহারও কোন দোষ দেখিতে পাও, তবে তাহাকে সস্নেহ তিরস্কার অথবা শিষ্টাচার-পূর্ণ উপদেশ দ্বারা সংশোধন করিয়া দিবে, কিন্তু সাবধান! তাহাকে কদাচ ঘৃণা করিও না।

৭। পাবক নিজ প্রজ্বলিত পরমোজ্জ্বল অঙ্গ গোপন রাখিবার জন্য প্রথমে শীতল ধূমরাশি উদ্‌গিরণ করে। সাধু ব্যক্তিও জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় জগতের পাপরাশি দগ্ধ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও শিষ্টাচার, বচনমাধুরী ও বিনয় সহকারে নিজ গুণগ্রামকে গোপন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বতোবিজয়ি তেজ জগতে অধিক দিন অপ্রকাশিত থাকে না।

৮। তুমি যদি কাহাকেও কোন সৎকর্ম্ম করিতে দেখ, তবে প্রফুল্ল চিত্তে উৎসাহ-পূর্ব্বক সহস্র কণ্ঠে

লোক-সমাজে তাহা ঘোষণা করিয়া আপনার জিহ্বা পবিত্র করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, তোমার নিজ অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের প্রশংসা-ঘোষণার ভার তোমার হস্তে প্রদত্ত হয় নাই।

৯। কুলটা কামিনীর পরপুরুষ সংসর্গজাত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যদি স্বামী নিজ পুত্রবোধে আদর বা স্নেহ প্রকাশ করেন, তদ্দর্শনে উক্ত পর-পুরুষ ও কামিনী এই বলিয়া মনে মনে হাস্য করে যে, কাহার বা পুত্র কে বা আদর করে! জীব এই সংসারে মায়া-বিমোহিত হইয়া দারাদিকে "আমার" বলিয়া কত যত্ন, কত সজ্জা ও কত শুশ্রূষা করিতেছে, কিন্তু দূর হইতে কাল এই বলিয়া হাস্য করিতেছে, হা মূঢ়! তুমি কাহাকে নিজবোধে যত্ন করিতেছ, কিছুই তোমার নহে, তুমি সত্বরই এতাবৎ হইতে বঞ্চিত হইবে। আবার জীবকে গৃহের বা উদ্যানাদির সীমা লইয়া প্রতিবাসীর সহিত বিবাদ করিতে দেখিলে পৃথিবী এই বলিয়া মনে মনে হাস্য করেন,—আমি কার, আর আমাকে কেই বা "আমার" বলিয়া অধিকার করিতে চাহে! জীব, আমি তোমাদের কাহারও নহি, বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর।

১০। মিষ্ট যেখানেই পড়িয়া থাকুক না কেন, পিপীলিকা দলে দলে আপনারাই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি সাধু বা গুণবান্, এ কথা নিজ মুখে কখনও ঘোষণা করিও না। যদি তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে প্রকৃত সাধু বা গুণী হও. তবে দেখিতে পাইবে যে, দলে দলে সৎসঙ্গী ও গুণগ্রাহিগণ তোমার উপদেশামৃত-পানে লালায়িত হইয়া তোমার গুপ্ত কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

১১। এত লোককে যে তুমি হাসিতে দেখিতেছ, তন্মধ্যে অনেকের হাস্যে গরল মিশ্রিত আছে। কেননা অনেকে পরের দুঃখ বা ছিদ্র দেখিয়া, পরের কুৎসা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া থাকে। আর এত লোককে যে রোদন করিতে দেখিতেছ, তন্মধ্যে অনেকের অশ্রুবিন্দুতে অমৃত মিশ্রিত আছে, কেননা অপরের দুঃখ দেখিয়া, পূর্ব্বকৃত নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া অথবা ভগবৎপ্রেমে বিগলিত হইয়া, কোন কোন মহাত্মার নিষ্পাপ নয়নে অশ্রুধারা বহিয়া থাকে।

১২। যদি পাপ করিয়া বিশ্বপতির পবিত্র পদে অপরাধী হইয়া থাক, তবে শীঘ্র সাধুদিগের শরণাগত হও, তাঁহারা অপরাধ-ভঞ্জনের সদুপায় বলিয়া দিবেন।

১৩। ভগবচ্চিন্তা দ্বারা যাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়াছে, প্রলয়-কালানল প্রজ্বলিত হইলেও তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। তিনি শান্তি-নীরে সর্ব্বথা সুশীতল থাকেন।

১৪। যদি তুমি সুখী হইতে চাও, তবে পরগুণ-গ্রাহী হও। যদি কাহারও কার্য্যদক্ষতা, কাহারও সাধু চেষ্টা, কাহারও উন্নতি, কাহারও বদান্যতা আদি দেখিতে পাও, তবে মানবকর্ত্তব্যের আদর্শ জানিয়া চক্ষে প্রেমের অঞ্জন লাগাইয়া তাঁহাকে দর্শন কর। পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা বা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া দাবানল-দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় স্বীয় জ্বালামালায় স্বয়ং ভস্মীভূত হইও না।

১৫। অনুকূল বায়ু বহিল, নৌকায় পাল তুলিয়া দাও, উজান জলে নৌকা তরঙ্গ-রাশির বক্ষঃ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। যদি নৌকায় যথোচিত দ্রব্য বোঝাই থাকে, তবে নৌকার গতি অতিদ্রুত হইবে, যদি খালি নৌকা হয়, তবে মৃদুবেগে যাইতে থাকিবে। মানব, ভগবানের কৃপা-বায়ু বহিতেছে, প্রেমের পাল তুলিয়া দাও, সংসারের বাধা, বিঘ্ন, যাহা তোমার সম্মুখে পড়িবে, সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন ও চূর্ণ

হইয়া যাইবে। গুরু-মন্ত্রের মাল বোঝাই করিয়া লও, নতুবা তোমার গতি অতি বেগবতী হইবে না। দিনের অবসান হইয়া গেলে ঠিকানায় পৌঁছিতে পারিবে না।

১৬। কোন শ্রেণীর সাধকেরা বলেন যে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে কিছু সার জন্মিয়াছে, তিনি লোকের নিকট প্রেমের কথা, জ্ঞানের কথা বলেন না, সদাই মৌনী হইয়া থাকেন, কেননা শুক্তিকার গর্ভে মুক্তা জন্মিলে শুক্তিকার মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

আমরা বলি, উহা শুক্তিকার পীড়া। দাড়িম্ব উত্তমরূপ পাকিলে তাহার বল্কল আপনি ফাটিয়া যায়, রসভরা রঙ্গিল দানাগুলি লোকের প্রাণ শীতল করে। মৌনী যোগীর সাধন-সিদ্ধি হইলেই তাঁহার কথা ফোটে এবং সেই কথা শুনিয়া জগৎ মাতিয়া যায়।

১৭। বৃক্ষাগ্রের ফলটী যাই সুপক্ক হইল, অমনি যে ভূমিকে আশ্রয় করিয়া বৃক্ষ দণ্ডায়মান সেই ভূমি-তলে খসিয়া পড়িল। ঐ যে গজস্কন্ধ দিগম্বর পুরুষটী আপনার ভাবে আপনি উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর যেন নিজ ভাবে সকলকে অভিভূত করিতেছেন, ঐটী সংসার-বৃক্ষের একটী সুপক্ক ফল। এখন সংসার

পরিহারপূর্ব্বক সংসারের আশ্রয়-ভূমি আনন্দস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।

১৮। ঐ দেখ কলিকাতা-তলগামিনী ভাগীরথী সাগরের অদূরবর্ত্তী বলিয়া উহাতে বারংবার জোয়ার আসিতেছে ও মধ্যে মধ্যে বাণ ডাকিতেছে; কিন্তু কানপুরের গঙ্গায় সেরূপ দেখা যায় না। যে জীবের আত্মা যোগবলে পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে, ঐশী শক্তির প্রবল তেজ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। প্রেমিক সাধক অলৌকিক ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনিই জগতে প্রেমময়ের গুপ্ত সমাচার উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করেন।

১৯। সিংহ, সর্প, ব্যাঘ্রাদিপূর্ণ এমন কোন গহন বন নাই, যেখানে তপস্বিগণ যাইতে ভয় করেন। কিন্তু ধনশালী ভোগবিলাসীর বাসভবন এরূপ ভয়সঙ্কুল যে, তথায় নির্ভীকহৃদয় বনবাসী তাপসগণ প্রবেশ করিতে সাহস করেন না। বিষয়ীর হৃদয় সর্পাদি হইতেও কুটিল।

২০। সাধক, তুমি যতই ভগবানের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকিবে, লোকসমাজ—তোমার বিষয়ী বন্ধুসমাজ—তোমার পূর্ব্ব আত্মীয় সমাজ—ততই তোমার বিরুদ্ধবাদী হইবে। তোমাকে আকর্ষণপূর্ব্বক

তাহাদের পদতলে ফেলিতে চেষ্টা করিবে, অযথা নিন্দাবাদে তোমার বিমল যশোরাশি মলিন করিতে যত্নবান্ হইবে; ভীত হইও না। দীনবৎসল ভগবান্ নিজ মঙ্গলময় হস্তে তোমার হস্ত ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিতেছেন; এখনই সমস্ত জগতের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তুমি লোকের দিকে মুখ ফিরাইও না, লোকের কথায় কর্ণপাত করিও না। জগতের সেবা করিবার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ কর নাই। তুমি যাঁহার, তাঁহার নিকট চলিয়া যাও, আনন্দ-রাজ্যে আনন্দ-নিকেতনে গিয়া নিবাস কর।

২১। সূর্য্য স্বীয় করপ্রভাবে বারিধির জল রাশিকে বাষ্পাকার করিয়া আকাশে আকর্ষণ করে। বাষ্পরাশি কিয়দ্দূর উঠিয়াই গম্ভীর গর্জ্জন ও ঘোর ঘনঘটামণ্ডল রচনা করতঃ, লোকের নয়নপথ আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। মূঢ় সংসার মনে করে, জলদজাল রবির কিরণ-মালা বিনষ্ট করিয়া দিল, প্রবল প্রভাকরের তেজস্বিনী শক্তি এখনই যে জলধরপটল বিগলিত করিবে, আকাশের জলধারা ধরায় বিলুণ্ঠিত হইবে, নির্ম্মল সূর্য্যরশ্মি পুনঃ পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে, ইহা মূঢ়গণ তখন বিস্মৃত হইয়া যায়।

সাধো, তুমি যাহাদিগকে স্নেহ পূর্ব্বক উপদেশ দিয়াছ, সৎপথে আকর্ষণ করিয়াছ, তাহারা আর বুঝি ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিল না। কিয়দ্দূর উঠিয়াই বৃথা বাগ্‌জাল রচনাপূর্ব্বক মূঢ়মণ্ডলীর সমক্ষে তোমারই বিরুদ্ধবাদ গান করিয়া, তোমার নির্ম্মল তেজঃ আচ্ছন্ন করিতে চায়। হায়! ঐ দেখ গুরুবিদ্রোহিগণ অলক্ষ্য তেজঃ প্রভাবে আনন্দরাজ্য হইতে বিচ্যুত, পতিত, ঘৃণিত ও লোকপদবিদলিত হইতেছে। সূর্য্যের কিরণ যেমন মেঘাগমে তদূর্দ্ধ গগন উদ্ভাসিত করিয়া রাখে, সাধুর বিমল তেজ তদ্রূপ বিরুদ্ধবাদিবর্গের দৃষ্টির অতীত স্বর্গরাজ্যের সেবা করিতে থাকে। সাধো, তুমিই ধন্য!!

২২। এক জন রাজা নিজ ভাণ্ডারে বিপুল বিত্ত-বিভব আছে জানিয়া মনে মনে ভাবিতেন, আমি বহু-সম্পত্তিশালী, আমার কোন বস্তুরই অভাব নাই। তাঁহার এ অভিমান অধিক দিন রহিল না। তিনি এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া একাকী গহনবনে গিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, অন্ধকারে পথ চিনিতে পারিলেন না। অগত্যা একটী বৃক্ষের আশ্রয় লইয়া থাকিতে হইল।

ক্ষুধায় রাত্রিতে কাতর হইয়া বৃক্ষের কটু কষায় ফল ভোজন করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আমি যে অভিমান করিতাম তাহা বৃথা, কেননা ধন বা কোন দ্রব্য যতক্ষণ নিকটে থাকে, ততক্ষণই কার্য্যকারী হয়। অতুল সম্পত্তিশালী রাজা হইয়াও আমাকে কাঙ্গালের ন্যায় বৃক্ষের ফল ভাঙ্গিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে হইল !

পাঠক, বিদ্যা, নীতি বা ধর্ম্মের কথা তোমার শাস্ত্রে অনেক আছে, ইহা ভাবিয়া অভিমান করিও না। যতক্ষণ তুমি তত্তাবৎ ভাল করিয়া অভ্যাস, নিজ জীবনের ব্রত ও প্রত্যেকটী কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তোমার সুখের আশা নাই। তুমি যেখানে যাও, যে অবস্থাতেই থাক, বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্ম তোমার সঙ্গে—তোমার হৃদয়ে—থাকা চাই।

২৩। দীন না হইলে দীননাথ দয়া করেন না। যাঁহার নিকট সূর্য্যমণ্ডল একটী ক্ষুদ্র বর্ত্তুল, পৃথ্বীমণ্ডল একটী সামান্য রজোরেণু মাত্র, জীব। তাঁহার সম্মুখে তুমি কোন্ সাহসে মস্তক তুলিয়া বল "আমি"? তোমার আছে কি, যে তাই তোমার এত অহঙ্কার? যাহা দেখিতেছ সমস্তই তাঁহার। তোমার কিছুই

নাই, তুমি দীন। একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, এখনই তোমার সমস্ত অভিমান চূর্ণ হইবে। দীন হইয়া তাঁহার নিকট রোদন কর, তাঁহার দর্শন পাইবে, তোমার কামনা পূর্ণ ও জন্ম সফল হইবে।

২৪। এই যে সহরের পথে পথে ও লোকের বাড়ীর ভিতরে বাহিরে, নীচে উপরে কল ঘুরাইলেই জল পড়িতেছে দেখিতেছ, ঐ সমস্ত জলই গঙ্গা হইতে যন্ত্রের টানে চলিয়া আসিতেছে। যে গৃহের জন্য যত অধিক কর রাজাকে প্রদত্ত হয়, সে গৃহের অধিকারী তত অধিক জল পাইতে পারে, সেইরূপ ত্রিতাপনিবারিণী ভগবৎ-কৃপা গঙ্গা হইতেই জীবের সুখ-শান্তি-ধারা প্রেমের আবেগে চলিয়া আসিতেছে, এ ধারা নিম্ন, ঊর্দ্ধ, বক্র, সরল, ছোট, বড়, স্ত্রী, পুরুষ আদি কিছুই বিচার করে না, কেবল যাহার হৃদয় রাজরাজেশ্বরের অধিকতর সেবা করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই সুখ শান্তি অধিক ভোগ করিতে পারে।

২৫। গঙ্গা অতিদূরে থাকিলেও, যেমন কলের টানে নলের ভিতর দিয়া প্রশস্ত পথে, সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরকার গৃহের ত্রিতলেও জলের ধারা ঝরিতে থাকে, সেইরূপ ভগবান্ গোলোকেই থাকুন বা

কৈলাসেই থাকুন, নিকটে থাকুন বা দূরেই থাকুন, মনের টান—প্রাণের টান—ভক্তির টান থাকিলে, তিনি গিরিকন্দরনিবাসী যোগীর নিকট, বনে পর্ণ-কুটীরবাসী ঋষির নিকট, রম্যহর্ম্ম্যস্থ পর্য্যঙ্কশায়ী ধনীর নিকট, অন্তঃপুরচারিণী রমণীর নিকট, ক্রীড়াপরায়ণ বালকের নিকট, দীনদুঃখী কাঙ্গালের নিকট অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আসিয়া দর্শন দেন।

২৬। যেমন ঘড়ীর কাঁটা কখন ধীর ও কখন দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে, তুমি বাহিরে কাঁটা যত বারই ঘুরাইয়া ঠিক করিয়া দেও না কেন, পুনর্ব্বার ধীর বা দ্রুত হইয়া যাইবে। ঘড়ীর ভিতরের যন্ত্র ঠিক করিয়া দাও, কাঁটা আর বেচাল হইবে না। তদ্রূপ কেহ অপথে বা কুপথে চলিলে সে বাহিরে সাধুর বেশ ধরিলে কি হইবে? সদ্‌গুরূপদেশে তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই সে সহজেই সুপথে চলিতে থাকিবে।

২৭। যেমন একটা মুখ ঢাকা হাঁড়ীর মধ্যে গন্‌গ’নে আগুন ভরা থাকিলে, তাহা ছায়াতে বা যে কোন শীতল স্থানেই রাখ না কেন, সে গরমই থাকিবে, সেইরূপ যাহার অন্তঃকরণ রাগ দ্বেষে ভরা,

কোন স্থানেই তাহার সুখ নাই। জলরাশি যেমন জ্বলন্ত অগ্নিকেও নির্ব্বাপিত ও সুশীতল করিয়া দেয়, তদ্রূপ "সন্তোষ" সন্তপ্ত ও উদ্বেজিত হৃদয়কেও সর্ব্বত্র সুখদান করিয়া থাকে।

২৮। হাঁড়ীতে জল চড়াইয়া অগ্নির তাপে চাঁউল ছাড়িলে উহা সিদ্ধ হইয়া নরম হয়, লোকে উহার সেবনে সুখলাভ করে, কিন্তু আরও অধিকক্ষণ তাপ পাইলে চাউলগুলি একেবারে গলিয়া যায়, তখন জলে চাউলে অভিন্নাকার ধারণ করে। এইরূপ যদি অষ্টাঙ্গ-যোগ বা ভক্তি-যোগ সাধনে পরমাত্মরূপে জলে জীব-রূপ তণ্ডুল তপস্তাপে সিদ্ধ হইতে থাকে, তবে প্রথমতঃ জীবের প্রকৃতি কোমল ও অতি বিনীত হয়, মনুষ্য সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে, কিন্তু আরও অধিক কাল অধিক তাপে পরিপক্ক হইলে জীব ভগবৎ-প্রেমে গলিয়া যায়, সেই অলৌকিক অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

২৯। যেমন দূর হইতে পর্ব্বত দেখিলে ঘনঘোর মেঘের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু যত নিকটস্থ হইবে ততই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালা, বিশাল বৃক্ষরাজি দেখা যাইবে, ক্রমে আরও নিকটে গেলে পর দেখিবে, তথায় গো, মহিষ

ও ছোট ছোট ছাগ, মেষাদি চরিতেছে, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে গেলে উহা অস্পষ্ট কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সাধনে অগ্রসর হও, তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি-সামর্থ্য, শোভা-সৌন্দর্য্য সকলই অনুভব করিবে, সিদ্ধিসমৃদ্ধিলাভ করিবে, পর্ব্বতের উচ্চচূড়ায় চড়িলে যেমন নিম্নে বিশাল বৃক্ষগুলি তৃণবৎ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ঈশ্বর-লাভের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মেন্দ্রাদির পদৈশ্বর্য্যও তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ হইবে।

৩০। যেমন কাশী আসিতে হইলে জল-পথে নৌকা যোগে, স্থল-পথে হাটিয়া বা রেলওয়ে গাড়ী প্রভৃতি চড়িয়া কাশী বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনে পৌছান যায়, তদ্রূপ কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, বা জ্ঞানযোগে একাগ্রচিত্তে ইহার যে কোন পন্থাই অবলম্বন করনা কেন, ধীরে ধীরে তাহাতেই পরমাত্ম-দর্শনে কৃতার্থ হইবে।

৩১। বাড়ীর ভিতরে সিঁড়ী দিয়া ছাদে উঠিতে পারা যায়, আবার বাড়ীর বাহিরে মৈ লাগাইয়াও ছাদে উঠা যায়, যাহারা ভিতরের সিঁড়ী দিয়া ছাদে উঠে, তাহারা বাটীর ভিতরকার শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, কিন্তু বাহিরে মৈ দিয়া উঠিলে সে শোভা দৃষ্ট

হয় না। পুঁথী, পত্র, শাস্ত্র আদি বাহিরের মৈ, এতাবতের সাহায্যে ভগবত্তত্ত্ব-কথা বলিতে বা বুঝিতে পারা যায়, সৌধ-শিখরারূঢ়ের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর লোক বা বড় পণ্ডিত হওয়া যায়, কিন্তু আত্মার তৃপ্তি লাভ হয় না। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, ভাবাদি ভিতরকার সিঁড়ী, এতদ্দ্বারা সাধনপথে চলিলে পরমাত্মার অপূর্ব্ব অনুভূতি, বিভূতি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

৩২। পঞ্জিকাতে লেখা থাকে, অমুক দিন সূর্য্যগ্রহণ হইবে। কিন্তু সকল স্থান হইতে ঐ গ্রহণ দেখা যায় না, এই জন্য জ্যোতিস্তত্ত্বদর্শিগণ যে স্থান হইতে গ্রহণ দৃষ্ট হয় সেই স্থানে সমাগত হইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা গ্রহের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ভগবান্‌কে লাভ করা সকলেরই লক্ষ্য হইলেও, সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক হইলেও, যে কোন ধর্ম্মাধিকারেই যে তাহা সিদ্ধ হয়, তাহা নহে; আত্মযোগের যথাস্থলে সমুপস্থিত না হইলে পরমাত্মার স্বরূপোপলব্ধি হয় না। সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক বলিয়া, চরমগতি-দানে সামর্থ্য সকল ধর্ম্মের একরূপ নহে।

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। "নীতি" শব্দের অর্থ কি?

উত্তর। গতি বা প্রাপ্তিকে নীতি কহে, অর্থাৎ যে কৌশলে কোন কার্য্যের ফল সুশৃঙ্খলে প্রাপ্ত হওয়া বা লাভ করা যায়, তাহার নাম "নীতি"।

প্র। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

উ। যে উপায়ে রাজা রাজকার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার নাম "রাজনীতি"; যে উপায়ে সমাজ সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয়, তাহার নাম "সমাজনীতি"; যে উপায়ে যুদ্ধ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম "সমরনীতি"; যে প্রণালীতে গৃহের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম "গার্হস্থ্য-নীতি"; যে উপায় দ্বারা মনুষ্যগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ভগবানের চরণকমল-লাভের উপযোগী হইতে পারেন, তাহার নাম "ধর্ম্মনীতি"; ইত্যাদি।

প্র। "নীতি" ও "সুনীতি" এই দুই শব্দে প্রভেদ কি?

উ। যাহাতে লওয়ায় বা প্রাপ্ত করায়, তাহাই

"নীতি"। সকল কার্য্যেরই নীতি আছে। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম করার মূলেও নীতি আছে, কিন্তু তাহাকে দুর্নীতি কহে। যে পথ অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে সুপথে লইয়া যায় বা সুফল দান করে, তাহার নাম "সুনীতি"। সুশিক্ষাই "সুনীতির" মূল।

প্র। সুনীতি শিক্ষার প্রয়োজন কি?

উ। সুনীতি শিক্ষা করিলে আমরা যখন যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, তাহা অনায়াসে ও শৃঙ্খলার সহিত সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারিব ও তদ্দ্বারা শুভ ফল প্রাপ্ত হইব। সুনীতি শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইলে বৃথা কলহ, বিবাদ, বিসংবাদ, অসভ্যতা, মূর্খতা, ধৃষ্টতা, ধূর্ত্ততা, কপটতা, প্রবঞ্চনাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়; বিচারালয়ে এত মিথ্যা অভিযোগ ও তজ্জন্য অযথা অর্থব্যয়ও হয় না; দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, বেশ্যালয়ে গমন, মদ্যাদি সেবন জন্য মহাপাপ ও সমাজের দারিদ্র্য দুঃখ বৃদ্ধি হয় না; সামান্য প্রভুত্ব লাভের জন্য নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিতও হয় না; অধিক কি, সমাজ নিতান্ত নিরুপদ্রব হইয়া উঠে। ইহার দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি

লাভ করিতে পারা যায়? পারিবারিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতাই সুনীতি শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে।

প্র। সুনীতি-মার্গ পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি কি?

উ। বেগবতী নদীর উপর যেরূপ সেতু থাকে, তদ্রূপ যাঁহারা এই ভয়াবহ দুষ্পার সংসার-নদীর পর-পারে যাইতে চাহেন, "সুনীতি-মার্গই" তাঁহাদের সুদৃঢ় সেতু-স্বরূপ। এই সেতু হইতে বিচ্যুত হইলে দুঃখ, ক্লেশ, বিনাশাদি প্রাপ্ত হইতে হয়।

প্র। নীতির অধীন হইয়া কার্য্য করা কি মনুষ্য-কল্পিত উপদেশ অথবা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত?

উ। ইহা মনুষ্যের কল্পনা নহে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাই এইরূপ যে, তাঁহার তাবৎ সৃষ্ট পদার্থই এক একটী বিশেষ বিশেষ নিরূপিত রেখাকে বা নীতিকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

প্র। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

উ। চন্দ্র সূর্য্য পূর্ব্ব দিক্ হইতে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইবে, ইহার অন্যথা হইলে পৃথিবীর অমঙ্গল ঘটিবে। গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল একটী নিয়মে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া বিস্তীর্ণ গগনমার্গে ভ্রমণ

করিতেছে; এ নিয়মের অন্যথা হইলে মহাদুর্ব্বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। মেঘ জল দান করিবে, অগ্নি উত্তাপ প্রকাশ করিবে, বায়ু নিঃশ্বাস যোগাইবে, বৃক্ষ ফল-পত্র-পুষ্প ও ছায়া দান করিবে, এতাবৎ প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহা লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরের এই সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে তাঁহার জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে। যেমন প্রকৃতি নিয়মের বশীভূত, আমা-দিগের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই তদ্রূপ নিয়ম বা নীতির অধীন হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে ক্লেশের লেশমাত্রও থাকিবে না। সুনীতিশিক্ষা ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সদ্বার্ত্তা

(শিষ্য ও আচার্য্য)

শিষ্য। মহাত্মন্, পৃথিবীতে অরোগী কে?

আচার্য্য। যাঁহার খলতা, কপটতা, কাম, ক্রোধাদি-রূপ বিকার নাই, তিনিই অরোগী।

শি। বীর কে? সুখী কে? ও বুদ্ধিমান্ কে?

আ। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনিই বিশ্ববিজয়ী বীর;

যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত সুখী; ও যিনি কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে পরিণামফল বিচার করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান্।

শি। জগতে ধন্য কে? ধনী কে? ও পরাধীন কে?

আ। যিনি সাধুচরিত্র, তিনিই ধন্য; যিনি সদাই সন্তোষযুক্ত, তিনিই প্রকৃত ধনী; ও যে কুবাসনার দাস হইয়া ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া থাকে, সেই পরাধীন।

শি। অন্ধ কে? বধির কে? ও বোবা কে?

আ। যাহার বিবেক ও সৎসঙ্গরূপ দুই চক্ষু নাই সে-ই অন্ধ, যে সদুপদেশপূর্ণ নীতিকথা শ্রবণ করে না, সে-ই বধির; ও যে মৃদু মধুর সত্য কথা কহিতে পারে না, সে-ই বোবা।

শি। মৃত্যু কি? স্বর্গ ও নরকভোগ কি?

আ। যে জীবন পবিত্রতা, পরোপকারশীলতা ও পরমার্থ-চিন্তাবর্জ্জিত, তাহাই মৃত্যু। সৎসঙ্গে কালক্ষেপ ও ভক্তি সহ ঈশ্বরের মননই স্বর্গ এবং ভগবানে অবিশ্বাস এবং অভিমান ও অহঙ্কারের উন্মত্ততাই নরকভোগ বলিয়া জানিবে।

শি। কমল অপেক্ষা কোমল কি? পাষাণ অপেক্ষা কঠিন কি?

আ। দয়ালুর হৃদয়ই কমলাপেক্ষা কোমল, এবং কুলটা কামিনীর হৃদয়ই পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।

শি। গ্রহণ করিব কি ও পরিহার করিব কি?

আ। সজ্জনের পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং কপট, কদাচারী ও বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে।

শি। প্রকৃত বন্ধু কে?

আ। তোমার দুঃখের দিনে যাঁহার নেত্রে অশ্রুধারা বহিবে, লোকমুখে তোমার নিন্দা বা কুৎসা শুনিলে যিনি তাহা অন্যের নিকট ঘোষণা না করিয়া তোমাকে গোপনে উপদেশ দিবেন, লোকে তদ্দ্বারা অলক্ষিত ভাবে তোমার লোকমর্য্যাদার মূলে অস্ত্রাঘাত করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে দেখিলে যিনি মৌনী না থাকিয়া বীরের ন্যায় তোমার পক্ষ সমর্থন করিবেন, সম্ভ্রান্ত লোক-সমাজে উপস্থিত হইলে, যাঁহার পদমর্য্যাদা তোমার অপেক্ষা অধিক সত্ত্বেও, যিনি নিরহঙ্কৃত ভাবে তোমাকে মিত্রোচিত সৎকার-সমাদর করিতে ত্রুটী করিবেন না, তুমি দুর্ভাগ্যবশতঃ দরিদ্র-দশাগ্রস্ত হইলেও যিনি তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রম ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেন, তোমার সাক্ষাৎকারে আপনাকে

সুখী মনে করিবেন, ও তোমার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদনের পরিবর্ত্তে তোমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে গৌরব মনে করিবেন, তুমি পীড়ায় কাতর হইলে যিনি সেই রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তোমার শুশ্রূষা ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবেন, তিনিই তোমার বন্ধু। নতুবা সর্ব্বদা কেবল তোমার সঙ্গে থাকিলে কিংবা তোমার মনোরঞ্জন করিলে বা আমোদ-প্রমোদে সহযোগী হইলেই বন্ধু হয় না। সদ্গুরু তোমার হৃদয়বন্ধু এবং ভক্তবৎসল ভগবান্ তোমার সকল বন্ধু হইতেও পরম বন্ধু।

শি। পিতা-মাতার লক্ষণ কি?

আ। যাঁহারা রক্ত, রস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, মাংস যুক্ত কেবল দেহের উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, কিন্তু বিদ্যা নীতি, ধর্ম্ম জ্ঞান আদি শিক্ষা দিয়া যাঁহারা পুত্র-কন্যার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ সাধন করেন, তাঁহারাই যথার্থ পিতা-মাতা।

শি। বলবান্ কে?

আ। শরীরের বল হইতে ধনবল শ্রেষ্ঠ, ধনবল হইতে বিদ্যাবল শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাবল হইতে বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিবল হইতে ধর্ম্মবল শ্রেষ্ঠ। যিনি তপোবল ও

ধর্ম্মবল দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনিই বলবান্।

শি। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ কে?

আ। যিনি ভগবানের পদকমল সেবন করেন তিনিই উচ্চপদস্থ।

শি। কি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য আর কিছুই চাহে না?

আ। ভগবানের কৃপা।

শি। কিরূপে তাঁহার কৃপা লাভ হয়?

আ। সুনীতির পথে চলিলে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ও তাঁহার চরণে শরণ লইলে।

প্রতিধ্বনি।

একদিন একটি শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট আসিয়া বলিল, মা, আমি দিদির সঙ্গে আমাদের পূজার দালানে খেলা করিতেছিলাম; দিদি খেলা করিতে করিতে কোথায় লুকাইয়া গেল, আর আমি যখন "দিদি, দিদি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, তখন আর একটা বালকও যেন

"দিদি" "দিদি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমিও চুপ করিলাম, সেও চুপ করিল। আমিও ডাকি, আবার সেও ডাকে। মা বলিলেন, সে কি বাবা! সে কাদের ছেলে? শিশু উত্তর করিল, হাঁ মা, সত্য সত্যই সেই ছোঁড়াটা আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল; সে কে? তাহাকে আমি চিনি না এবং দেখিতেও পাই নাই। আমি যখন "হো" করিয়া চীৎকার করিলাম, সেও "হো" করিয়া উঠিল; আমিও করতালি দিলাম, সেও করতালি দিল। আমি বলিলাম, "তুই কে রে?" সেও বলিল "তুই কে রে?" আমি বলিলাম "তোর নাম কি?" সেও বলিল "তোর নাম কি?" আমি বলিলাম "চুপ কর্," সেও বলিল "চুপ কর্"। আমি রাগে জ্ঞানহারা হইয়া তাহাকে মারিব বলিয়া চারি দিক্ অনুসন্ধান করিলাম, এ ঘর ও ঘর খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। অভিমানে দুঃখে আবার দালানে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "তোকে দেখিতে পাইলেই মারিব," সেও বলিল "তোকে দেখিতে পাইলেই মারিব"। মা, এই ছেলেটাকে আমাদের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও। মাতা পুত্রের নিজকৃত শব্দের প্রতিধ্বনির

লীলা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, বাছা, তুমি না বুঝিয়া রাগ করিতেছ কেন? তুমি যদি তাহাকে বলিতে, "ভাই আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি", তাহা হইলে শুনিতে পাইতে, সেও বলিত "ভাই আমি তোমাকে বড় ভাল বাসি"। তুমি যদি বলিতে "তোমার কথা বড় মিষ্ট", তাহা হইলে সেও বলিত "তোমার কথা বড় মিষ্ট"। এখন হইতে আর কাহাকেও কটু সম্বোধন করিও না, তোমাকেও কেহ কটু বলিবে না। সকলকে যে ভাল দেখে, সকলেই তাহাকে ভাল দেখে। যে সকলকে মন্দ দেখে, লোকেও তাহাকে মন্দ দেখে। বাছা, জগতে নিজকৃত ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে। তুমি যখন বড় হইবে, লোকসমাজে মিশিবে, তখনই প্রতিধ্বনির মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। তুমি লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, লোকেও তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে। তুমি কাহাকেও ভয় দেখাইও না, তুমিও কোনরূপ ভয় পাইবে না। লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিলে তুমি সাহায্য করিও, তুমিও নিজ বিপৎকালে সহায়তা পাইবে

বিষম পরীক্ষা।

এ কি ভয়ানক পরীক্ষা! আমি বর্ষে বর্ষে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়াছি, বর্ষ কাল পরিশ্রম ও যত্নপূর্ব্বক অধীত বিষয়ের অভ্যাস করিয়া আমি সে সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। প্রশংসা-পত্র, ছাত্র-বৃত্তি ও পারিতোষিকও পাইয়াছি। কিন্তু এই বিষম পরীক্ষার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মন চকিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বলিতে ও লিখিতে পারিলেই হইত, এ পরীক্ষায় কণ্ঠস্থ বিদ্যা কিছুই সহায়তা করিতে পারে না। ইহার পরীক্ষক দুই এক জন লোক নহেন; এই পরীক্ষায় তৃণ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলেই পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকৃতি স্বয়ং প্রশ্ন নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কোন্ অনন্ত গ্রন্থ হইতে এতাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা কখনও পাঠ করি নাই। শুনিয়াছি, এই পরীক্ষায় যে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহাকে আর কখনও পরীক্ষা দিতে হইবে না।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি আদিকে সংযত ও নিয়মিত

করিতে না পারিলে এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অসাধ্য। হায়! আমাকে এই বিষম পরীক্ষা দিতে হইবে, এ কথা যদি পিতামাতা প্রথমেই বলিতেন, ও প্রথম হইতেই তদনুকূল শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে আজ এক একটী প্রশ্ন শুনিয়া আমার গাত্র শিহরিয়া উঠিত না। বালক-কালে আমার দুষ্টতা, ধৃষ্টতা, ব্যাপকতা, চঞ্চলতা প্রভৃতিকে "বালক-প্রকৃতি" বলিয়া পিতামাতা উপেক্ষা করিয়াছেন। কাল সহকারে সেই দুর্ব্বীজ রাশি হইতে বিষ-কণ্টক-তরু উৎপন্ন হইয়া আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। এখন কুবৃত্তিসমূহ আমার হৃদয়কে নিজ নিজ নৃত্যভূমি করিয়া লইয়াছে, ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। নীতি ও ধর্ম্মের সকরুণ অভয়বাণী শুনিয়াও আর ইহারা মানিতে চাহে না। পরীক্ষার প্রত্যেক প্রশ্নেই ইন্দ্রিয়গণ ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ অসদুত্তর লিখিতেছে। এবার বুঝি আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না! মনের আশা মনের ভরসা বুঝি মনেই মিশাইল। হায়! সমাজের দোষে, পিতামাতার অযথা আদরে, শিক্ষকের অযত্নে এবং আমার আলস্য, ঔদাস্য, উপেক্ষা ও অবহেলায় আজ আমি নিঃসহায়ের ন্যায় প্রশ্নের

উত্তরদানে অপারগ হইলাম! সাধুগণ, সিদ্ধগণ, আর্য্যগণ, মহাত্মগণ, একবার শীঘ্র তোমরা তোমাদের তেজস্বিনী তীব্র শক্তির প্রবাহে আমার সাঙ্কেতিক বল বিধান কর, আমি যেন অক্লেশে এই "বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষম পরীক্ষায়" প্রশ্ন গুলির সদুত্তর লিখিয়া তোমাদের পরমপদ লাভ করিতে পারি। অনাথনাথ, দীন-দয়াল, আজ এই বিষম পরীক্ষায় সহায়তা কর। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।

ত্রাহি মাম্।

নীতি ও ধর্ম্ম।

নীতি ও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই শরীর, মন ও আত্মার অধিপতি। কেননা ইহা দ্বারা শরীর রক্ষিত, মন সুশাসিত এবং আত্মা পরম আনন্দিত হইয়া থাকেন। নীতি ও ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্বের ভিত্তিমূল। মনুষ্য যতই কেন প্রতাপী, বলবান্, চতুর, বহুদর্শী ও বিজ্ঞ হউক না; ধর্ম্মবর্জ্জিত হইলে মনুষ্য পশুবৎ। যে দেহে ধর্ম্মের-

স্ফুরণ নাই, সে রাজা হয় হউক, বীর হয় হউক, মানী ও গুণী হয় হউক কিন্তু সে কখনই মনুষ্য নহে। তুমি সংসারে বড় বড় কার্য্য কর, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণতা ভিন্ন তুমি লবণশূন্য ব্যঞ্জনের ন্যায়, গন্ধশূন্য পুষ্পের ন্যায় নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। ঐ পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে,—যে নেপোলিয়ানের মহাতেজে ভূমণ্ডল টলমল করিয়া উঠিল, বীরনিনাদে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইল, দেখিতে দেখিতে ধূলার সেই নেপোলিয়ান ধূলায় মিশিয়া গেল। তেজ ও প্রতাপের ছায়া আকাশের একটি গুপ্ত স্তরে বিভব ও দর্পের হস্ত ধরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। তিনি নিজ জীবনের যে অমূল্য অংশটুকু পরবিভব-হরণে নষ্ট করিয়াছিলেন, সে সময়টুকু যদি তিনি নিজ প্রশস্ত হৃদয়ে পরের উপকার ও নিজ আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতই চিরঞ্জীব বিশ্ববিজয়ী বীর হইতেন। ঐ দেখ তোমার সম্মুখে কত গণিত-বিদ্যা-বিশারদ, দর্শনাস্ত্রে পারদর্শী, বিজ্ঞানে সুনিপুণ ব্যক্তি বিদ্যমান রহিয়াছেন; কিন্তু বল দেখি, ইহারা উচ্চ-শিক্ষালাভ করিয়াও এত অহঙ্কৃত, এত গর্ব্বিত, বিদ্বেষবুদ্ধিবিশিষ্ট ও পরশ্রীকাতর হইয়াছেন কেন?

জানিও, বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অভ্যাস না থাকিলে মনুষ্যের শিক্ষা এইরূপ বিকলাঙ্গ হয় ও হৃদয়কে কদর্য্যভাবে গঠিত করে। ইন্দ্রিয়গণই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। উহাদিগের গতি রোধ করা সহজ নহে। যতদিন পর্য্যন্ত উহারা সংযত ও সুপথগামী না হইবে, ততদিন উহাদিগের দ্বারা সাধু কার্য্য সংসাধিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? নীতিধর্ম্মই এই ইন্দ্রিয়বর্গের শৃঙ্খল ও অঙ্কুশ স্বরূপ। ইন্দ্রিয়গণ নীতি ও ধর্ম্ম অনুসারে পরিচালিত হইয়া যে কার্য্য করিবে তাহা সাধু, সন্তোষকর ও মনুষ্যোচিত হইবেই হইবে। কবি স্বরচিত কবিতাকুসুমমালার সৌগন্ধে জগতের লোকের মন বশ করিতে পারেন, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ; কিন্তু নিজের মন বশ করা হয়তো তাঁহার পক্ষে হস্তদ্বারা জলদস্খলিত বজ্রধারণের ন্যায় অতীব সুকঠিন। ঐ দেখ কত দার্শনিক নিজ কূটতর্ক-তরবারি দ্বারা লোকের তীব্র তর্কজালকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছেন, কিন্তু ক্রোধ, অভিমান, দুরাগ্রহ ও দুরাশা তাঁহাদের হৃদয়ে বিশাল বট বৃক্ষের ন্যায় ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাহার একটি পল্লবাগ্রভাগও ছেদন করিবার সামর্থ্য

তাঁহাদের নাই। ঐ দেখ বৈয়াকরণ কত লোকের অশুদ্ধি সংশোধন করিতেছেন, বাগ্‌জালে সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার নিজ হৃদয়ের অশুদ্ধি শোধনের সামর্থ্য তাঁহার কৈ? ভাই, তুমি যতই পড়, যতই বল, যতই কর, নীতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুগত না হইলে, নীতি ও ধর্ম্মের অনুশাসন না মানিলে, তোমার সমস্তই ব্যর্থ—তোমার সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড। স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়পটে লিখিয়া রাখ, "মনুষ্যের পক্ষে ধন তত আবশ্যক নহে, সামর্থ্য ও বল তত প্রয়োজনীয় নহে, চাতুরী ও যশঃ তত কার্য্যকর নহে, স্বাধীনতা ও প্রতাপ তত প্রার্থনীয় নহে, বিশুদ্ধ আচরণ ও বশীকৃত চিত্ত মানবের যত অবশ্য আবশ্যক"। কেবল ইহার দ্বারাই আমরা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। যদি ইহাতে পরম সুখের সঞ্চার না হয়, তবে জানিবে আর কোন উপায়েই তাহা হইবে না। অতএব কায়মনোবাক্যে আর্য্যদিগের কথিতানুরূপ সদাচারাদি—নীতি ও ধর্ম্মের সেবা করিয়া জন্ম সার্থক, জীবন পবিত্র ও তাপিত প্রাণ সুশীতল কর।

একটী নীতি কথা।

একদিন জনৈক সম্রাট্ পারিষদ্‌বর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া নির্ম্মলবায়ু সেবনার্থ নির্গত হইতেছিলেন, এরূপ সময়ে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নয়নপথের পথিক হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে এই বলিতেছিলেন যে, যে আমাকে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিবে, আমি তাহাকে একটী নীতি-উপদেশ দিব। সম্রাট্ এই বিস্ময়কর বাক্যে বিমোহিত হইয়া বলিলেন, আপনি দশ সহস্র মুদ্রা লইয়া কি উপদেশ দিবেন? সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ, আমাকে নিয়মিত মূল্য দানের আদেশ হইলেই আমি আপনাকে সেই অমুল্য উপদেশটী দিব। সম্রাট্ কোন অপূর্ব্ব বিষয় শ্রবণ করিবার লালসায় তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীকে দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দানের আদেশ করিলেন। মূল্য প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন মহারাজ, "পরিণাম বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না" ইহাই আমার নীতি-উপদেশ।

সম্রাট্ এই সামান্য উপদেশ লাভে সন্ন্যাসীর উপর রুষ্ট হইয়া হয়তো তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা কবিবেন, মনে করিয়া পারিষদগণ উপহাস করতঃ সহাস্যমুখে সম্রাটের

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সম্রাট্ এই সারগর্ভ উপদেশে আনন্দ ও বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর এই উপদেশে উপহাস করিবার কোন বিশেষ হেতু দেখিতে পাই না, বরং আমার মনে হইতেছে যে, যদি মনুষ্যগণ সর্ব্বদা এই উপদেশটী স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে তবে সে নিশ্চয়ই অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। আমি এই গভীরমর্ম্ম উপদেশটী আমার রাজভবনের ভিত্তির উপর স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া এরূপ ভাবে রক্ষা করিব যে, উহা যেন সর্ব্বদা আমার নয়নপথে পতিত হয়। অতঃপর সম্রাট্ সন্ন্যাসীকে প্রণামপূর্ব্বক নিজ-ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রধান ভাস্করকে এই নীতি-উপদেশটী স্বর্ণাক্ষরে প্রস্তরে খোদিত করিয়া তাঁহার প্রাসাদের স্থানে স্থানে রক্ষা করিতে আজ্ঞা করিলেন।

এই ঘটনাটীর পর কিয়দ্দিবস অতীত হইলে রাজার জনৈক দাম্ভিক ও উচ্চপদাভিলাষী প্রধান অমাত্য সম্রাট্‌কে নষ্ট কয়িয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিল; এবং এই দুরভিসন্ধি-সাধনবাসনায় রাজবৈদ্যকে একখানি বিষোপলিপ্ত অস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক বলিল, যদি আপনি কোন প্রকারে

এই অস্ত্রাগ্র সম্রাটের অঙ্গে বিদ্ধ করিয়া শোণিত স্পর্শ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব, এবং আমি সিংহাসনে আরোহণ করিলে আপনাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিব। রাজচিকিৎসক ধনলোভে অন্ধ হইয়া হিতাহিত-চিন্তা-শূন্যহৃদয়ে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। দৈব-বশাৎ এই দুরভিসন্ধি-সাধনের একটী সুযোগও উপস্থিত হইল। সম্রাট্ তাঁহার শরীরের কোনও পীড়িত অংশ অস্ত্র করিবার জন্য উক্ত চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। চিকিৎসকও অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে সেই বিষোপলিপ্ত অস্ত্রখানি লইয়া গেলেন এবং যখন তিনি ঐ অস্ত্রখানি সম্রাটের পীড়িত অঙ্গে প্রবেশ করাইবেন এইরূপ উপক্রম করিতেছিলেন, অমনি অকস্মাৎ ভিত্তিতে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত "পরিণাম বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না" এই তীব্রজ্বলন্ত নীতি-উপদেশটী তাঁহার চক্ষে পড়িল। অস্ত্র-চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইলেন ও বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, যদি আমি এই অস্ত্রদ্বারা রাজ-শোণিত স্পর্শ করি, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবেন এবং আমিও বন্ধন-দশাগ্রস্ত ও পরলোকে

প্রেরিত হইব। তখন দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমার কোন্ কার্য্যে লাগিবে! এই চিন্তা করিয়া চিকিৎসক সেই অস্ত্রখানি পুনর্ব্বার অস্ত্রকোষে রক্ষা করিয়া অপর একখানি অস্ত্র বাহির করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার মুখ ম্লান ও মনোগ্লানির লক্ষণ দেখিয়া অকস্মাৎ অস্ত্র পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন, উহার অগ্রভাগ ভগ্ন। কিন্তু সম্রাট্ এই বাক্যে সন্দিহান হইয়া সেই অস্ত্রখানি প্রদর্শনের আদেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বলিলেন এই ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, শীঘ্র তাহার তাবত্তত্ত্ব ব্যক্ত কর, নতুবা তোমার মস্তক ছেদন করা হইবে। অস্ত্রচিকিৎসক ভয়ে কম্পিত-কলেবরে তাঁহার নিকট অভয় প্রার্থনা পূর্ব্বক তাবদ্বিষয় বিবৃত করিতে অঙ্গীকার করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে অভয় দান করিলে চিকিৎসক সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, যদি ঐ স্বর্ণাক্ষরে খোদিত নীতি-উপদেশটী আমার চক্ষুর্গোচর না হইত, তবে নিশ্চয়ই এই বিষোপলিপ্ত অস্ত্রখানি ব্যবহার করিতাম।

অতঃপর সম্রাট্ সভা আহ্বানপূর্ব্বক আততায়ী

পারিষদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিয়া অমাত্যগণকে কহিলেন যে, সন্ন্যাসীর যে উপদেশটীকে তোমরা উপহাস করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার মূল্য বিবেচনা কর। ইহাই আমার জীবন রক্ষা করিল। সেই সন্ন্যাসীকে অনুসন্ধান পূর্ব্বক পুনরানয়ন কর, আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার পারিতোষিক দান করিব।

উপর্য্যুক্ত নীতি-উপদেশটী সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কয়েকটী সার কথা।

তুমি যাহা নিজে করিতে অসমর্থ, লোকে তাহা করিতে না পারিলে তাহাকে নিন্দা করিও না। যদি কাহারও কার্য্য দেখিয়া তুমি বিরক্ত হও, তবে তাহাকেও তোমার ন্যায় অসমর্থ বিবেচনায় দুঃখিত হইও, করুণার্দ্র হইও, কিন্তু ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করিও না। উচ্চ সামর্থ্য ও উন্নত অধিকার লাভ করিবার জন্য আচার্য্যোপদিষ্ট সৎকার্য্যসমূহের যথোচিত অনুষ্ঠান করিবে, কেবল সৎকার্য্যের জল্পনা করিয়া বেড়াইও না। সন্দেশ না খাইলে, কেবল সন্দেশের দোকান দেখিলে,

বা সন্দেশের গল্প করিলে অথবা কি উপাদানে সন্দেশ প্রস্তুত হয় তাহা জানিলে মুখ মিষ্ট হয় না—পেটও ভরে না। যখনই অন্যের নিন্দা করিতে তোমার ইচ্ছা হইবে তখনই একবার নিজ মলিন হৃদয়ের কপাট খুলিয়া নিজকৃত অপরাধরাশির দিকে তাকাইবে, তাহা হইলে আর পরনিন্দা করিতে ইচ্ছা হইবে না। পরের কথায় সময় ক্ষেপ না করিয়া নিজ তত্ত্বের সন্ধান করিবে। নিজের বিষয়ে এত জানিবার ও এত বুঝিবার আছে, এত ভাবিবার ও এত সংস্কার করিবার আছে, যে তোমার আমার চিরজীবনে তাহারই কুলান হওয়া দুষ্কর, তবে পরের কথায় কর্ণপাত করিবে কখন? লোকের একটী দোষ দেখিলে তুমি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হও, কিন্তু তোমার দৌরাত্ম্যে যে তোমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য কি করিলে? তোমার ইচ্ছা যে সকলেই তোমার মনোমত হয়, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সকলের মনোমত হইয়াছ? যদি না হইয়া থাক, তবে তাহা হইবার চেষ্টাই প্রথমে কর। অন্যের সৌজন্য ও সৌষ্ঠব দেখিতে ইচ্ছা করিবার পূর্ব্বে তুমি স্বয়ং সুজন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হও। তুমি আপনি না

হাসিলে অন্যকে হাসাইতে পারিবে কেন ? ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া তুমি যখন আপনি কাঁদিয়া ফেলিবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে লোককেও কাঁদিতে দেখিবে। তুমি যদি অন্যের মলিন গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিতে চাও, তবে অগ্রে তোমার নিজ হস্ত পরিষ্কার করিয়া লও। অন্য বস্তু দেখিয়া বিচার করিবার পূর্ব্বে তোমার নিজ চক্ষুতে কোন দৃষ্টিদোষ আছে কি না তাহা ভাল করিয়া বিচার করিও। যেমন কোন দুরারোহ ভূমিতে উঠিতে হইলে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া উঠিতে হয়, সেইরূপ পাপ-পিচ্ছিল এই সংসার-ভূমি হইতে উঠিবার জন্য পরস্পরের স্নেহ ও প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সুহৃদ্‌ভাবে সাহায্য করিয়া, পরস্পরের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে ; নিন্দা, গ্লানি আদি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা মারিলে সকলেই পড়িয়া যাইবার সম্ভব। সকলেই নিজ নিজোচিত পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, নিজ নিজ ঠিকানা ঠিক রাখিয়া অগ্রসর হও। সজ্জনের সহায় ভগবানের পবিত্র-শক্তি সকলের ক্ষুদ্র শক্তিতে সঞ্চারিত হইবে। ভাবনা থাকিবে না—ভয় থাকিবে না—কুশলে আনন্দকাননে পৌঁছিতে পারিবে। পুনর্ব্বার

বলিতেছি, আপনার নিজের পায়ের ঠিকানা ঠিক রাখিও।

নীতি-রত্নমালা।

স্থনীতি শিখিলে শিশু থাকিবে কুশলে।
কুকর্ম্ম-কণ্টকমালা পরিও না গলে॥

(সু) বোধ, সুশীল, শান্ত হ'য়ে সদাচারী।
বি (নী) ত থাকিবে, হবে পর উপকারী॥
উন্ন (তি) করিবে লাভ সাধু উপদেশে।
না হবে (শি) থিল-যত্ন কুশল উদ্দেশে॥
চিন্তিবে অ (খি) ল-নাথে শাস্ত্রবিধি-মত।
তাঁর কৃপা হ' (লে) হবে কল্যাণ সতত॥
নীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান (শি) ক্ষা-বিহীন যে জন
জানিবে তাহারে প (শু) বলে সাধুগণ॥
পিতা মাতা প্রভৃতির (থা) ক অনুগত।
কুসঙ্গে কি কুপ্রসঙ্গে থা (কি)বে বিরত॥
শারীরিক মানসিক করি (বে) উন্নতি।
পরপীড়া, পরচর্চ্চা ছাড়িবে (কু) মতি।
করিবে দেশের হিত নৈতিক কৌ (শ) লে
ভারতের জয়গাথা গাহিবে সক (লে)॥

(কু) যশ রটে না যেন তোমাদের নামে।
অ (ক) লঙ্ক কার্য্যে রত রবে’বর-ধামে॥
অধ (র্ম্ম) গহন বনে কভু না যাইও।
শাস্ত্রের (ক) থায় কভু হেলা না করিও॥
করিবে ব (ণ্ট) ন জ্ঞান-সুধা সর্ব্ব জনে।
বিভুর সেব (ক) হ’য়ে থাক হৃষ্টমনে॥
করিও না অভি (মা) ন লভি বিদ্যা, ধন।
রেখো না মনের ম (লা) অসাধু জীবন॥
হউক তোমার উচ্চ (প) দ মনোমত।
হও বি, এ, এম্, এ, অনারা (রি) আছে যত॥
“রাজাবাহাদুর” পদ হ’লে (ও) তোমার
অথবা থাকুক পূর্ণ তব ধ (না) গার॥
কিন্তু “নীতি-রত্নমালা” না থাকিলে (গ) লে।
নিশ্চয় তোমারে শিশু, ঘৃণিবে সক (লে)॥

অই।

আমায় ঘুমের ঘোরে ডাক্‌লে বল কে,
সুমিষ্ট কথা গুলি তার।
আমায় ডেকে গেল রেখে গেল সে
ঘুম ভাংতে ভাংতে ভাংলো না আমার॥

সে কথা ব'লে কোথা লুকা'লো,
সে কথা গুলি শুনিতে ভালো,
সে আদরেতে ডেকে ছিল,
কি আমায় ব'লে গেল,
সব আমি ভু'লে গেলাম
ঘুমের আবেশে।
সে ডাক্‌লে আমায় বাছা ব'লে
আহা! ব'লে নিলে কোলে
মুখ খানি মুছিয়ে দিলে
ব'ল্লে কত মার মত হেসে॥
যেন কি এক মন্ত্র প'ড়ে
ফুঁ দিল আমার নয়নে।
অমনি চোখ দুটি খু'লে দেখি
ব'সে আছি অমর ভবনে॥
আমার হৃদয় খুলে হাত বুলা'য়ে
কি যেন ঝাড়িয়া দিল!
কি যেন কালী-মাখা মলে-ঢাকা
উঠা'য়ে নিল॥
প্রাণ শীতল হ'ল, জুড়াইল;
কোথা গেল সে।

আমি তারই তরে একলা ঘরে,
আছি আজ ব'সে ॥
আমি চিনি চিনি তবু তারে
চিনতে পারি কই।
জগন্মাতা "সুনীতি" বা বুঝি হবে অই ॥

শ্রীপঞ্চমী।

"বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্তে
ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে।"
কেগো শ্বেত-শত-দল-সরোজ আসনে।
কুন্দ-বিনিন্দিত কান্তি, বসন্ত বসনে ॥
শোভিছ ? কৌমুদী যেন ঝলকে প্রভায়।
আলো করি দশ দিক্ নিজ প্রতিভায় ॥
তরুণ অরুণ যেন চরণের শোভা।
ও পদ দুখানি কেন এত মনোলোভা ॥
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে কত পায়।
পদ-পরশেতে প্রাণ জুড়াইয়া যায় ॥
শ্রীকর-কমলে বেদ, লেখনীর সাজ।
ভারত-আকাশে পুনঃ কে এলিগো আজ॥

মায়ের মাধুরী মাখা দেখি মুখ খানি।
হাসিতে মোহিত ধরা, সুমধুর বাণী ॥
চিনেও চিনিতে নারি কেবা এই সতী।
তুই কি মা ভারতের পুরাণ ভারতী ? ॥
কেন মা আবার হেথা আইলি এখন।
কে তোরে পূজিবে দিয়া কুসুম চন্দন ॥
আছে কি সে বেদব্যাস, আছে কি বাল্মীকি।
বেদাভ্যাসী মুনিগণ আর মা আছে কি ॥
আছে কি মা কালিদাস বিদ্যায় বিভোর।
আছে কি ভারত আর ভারতে মা তোর ॥
আছে কি মা চণ্ডীদাস শ্রীকবিকঙ্কণ।
আছে কি মা কাশী, কৃত্তি, পূজিবে চরণ ॥
আছে কি মা গার্গী, খনা, লীলাবতী আর।
আছে কি তুলসীদাস সেবক তোমার ? ॥
আমরা মা ভুলিয়াছি পূজা-উপচার।
ছাড়ি দিয়া ব'সে আছি বেদ-ব্যবহার ॥
কিরূপে আদর তোরে করিতে যে হয়।
ভুলিয়া গিয়াছে মা এ মলিন হৃদয় ॥
কদাচারে কলুষিত দেহ প্রাণ মন।
কেঁপে উঠে পরশিতে ও রাঙ্গা চরণ ॥

অহঙ্কারে ঊর্দ্ধ গ্রীবা সদাই মা রয়।
তব পদে প্রণমিতে নত নাহি হয়॥
সাধিয়া বিলাতী বাণী জিহ্বা জড়বাদী।
উচ্চারিতে বেদ-মন্ত্র না চাহে আস্বাদি॥
পূজিতেন তোরে আর্য্যগণ প্রাণ ভরি।
তাঁদের সন্তান বলি কত গর্ব্ব করি॥
দেখ্ মা পাষাণ-দ্বার হৃদয়ের খুলি।
মাখিয়াছি কত পাপ তাপ কালী ঝুলি॥
মুছাইয়া দে মা তোর ছেলেদের মলা।
অঞ্জনে করিয়া দে মা নয়ন উজলা॥
বেদ-বিধি-স্তন্য দে মা করাইয়া পান।
সংসার ক্ষুধার জ্বালা হ'ক অবসান॥
স্পর্শ করি গঙ্গাজল হব সুশীতল।
তবে তো পূজিব গো মা ও পদ-কমল॥
আয় গো মা একবার করি দরশন।
নয়নের জল দিয়া ধুয়াই চরণ॥
আমাদের সম্বল মা আর কিছু নাই।
"দেহি নো বিমলাম্ভক্তিম্" এই ভিক্ষা চাই॥

বন-বৃক্ষ।

পত্রে সুশোভিত কায়, তরু বল রে আমায়,
কে তোরে গভীর বনে দিয়াছে বিদায়।
আছ কিরে অভিমানে, দাঁড়া'য়ে একান্ত স্থানে,
অথবা কাহার তরে বিরহ ব্যথায়;
ত্যাগ করি জনপদ রয়েছ হেথায়॥

দেখি মুখে কথা নাই, মৌনী কেন রে সদাই,
কি ভাবে নীরব এত বল শুনি তাই।
অথবা কি দোষ করি, লোকালয় পরিহরি,
লুকা'য়ে নিভৃত স্থানে, যথা কেহ নাই।
বলে না মনের কথা এ বড় বালাই॥

দেখি কানন ভিতরে, কে বা সংখ্যা তার করে,
আছে কত তরু, কথা নাহি পরস্পরে।
পরিয়া বিচিত্র সাজ, শোভিছে কানন মাঝ,
অবাক্ হইয়া তারা আছে থরে থরে।
এ ভাব কেন রে বল সরল অন্তরে॥

দেখে এই হয় মনে, যেন নৈমিষ-কাননে,
সহস্র সহস্র ঋষি বসি যোগাসনে।

করি নেত্র নিমীলিত, স্থির ভাবে সমাহিত,
নিরন্তর নিমগন নিত্য নিরঞ্জনে।
তথা নাহি কথা কয় কেহ কা'রো সনে॥

পূর্ব্বে ছিলে সামান্যতঃ, বীজ বালুকার মত,
হইলে প্রকাণ্ড-কাণ্ড দীর্ঘ হস্ত শত।
বল কার ইন্দ্রজাল, সহায় করিয়া কাল,
ক্ষুদ্রকে মহত্ব দানে নহেক বিরত।
তাহারি ভাবে কি তুমি বিহ্বল সতত॥

আহা কিবা মনোহর, দৃশ্য দেখিতে সুন্দর,
গভীর শ্যামল বর্ণে শোভে তরুবর।
শাখায় পল্লব চয়, কিবা তাহে কিশলয়,
কত যে ফুটেছে ফুল অঙ্গ-শোভাকর।
আনন্দে হাসিছে যেন ভূরুহ নিকর॥

ঘোর গভীর কাননে, জন-বিহীন বিজনে,
কে তোরে সাজা'য়ে দিল কুসুমাভরণে।
সৃজন-কুশল বিধি, দিয়া কি অমূল্য নিধি,
নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য নিজ নিরখি নয়নে।
আপনি হয়েছে মুগ্ধ আপনার মনে॥

হ'য়ে মোহিত শোভায়, বুঝি মন নাহি চায়,
দেখা'তে এ অপরূপ লোকের সভায়।
একান্তে রেখেছ তাই, হেরি বলিহারি যাই,
গুণের গৌরব তারি মন সদা গায়।
যে জন বিজনে করে সৃজন তোমায়॥

ফল-ভারে অবনত, শাখা-প্রশাখাদি কত,
এ ফল কিরূপে পেলে করি কোন্ ব্রত।
লইয়া কুসুম রাশি, আনন্দ সাগরে ভাসি,
হাসি মুখে কারে দাও অঞ্জলি সতত।
সেই ফল-দাতা ফল দেন কি এ মত?॥

শাখী, দেখি কি আবার, পাখী কত অনিবার,
আসি বসি তব অঙ্গে গায় গুণ কার।
তাই কি সানন্দ মনে, দাও হে বিহঙ্গগণে,
মধুর সুপক্ক ফল করিতে আহার।
তাহারা কি দেয় প্রেমময় সমাচার?॥

সদা শীতোষ্ণ সহিয়া, এক পদে দাঁড়াইয়া,
কাহার উদ্দেশে ঊর্দ্ধে রয়েছ চাহিয়া।

জিজ্ঞাসিলে নিরুত্তর, ভাবেতে প্রকাশ কর,
"অব্যক্ত সেরূপ, দেখ যোগেতে জাগিয়া"।
তাই কি থাকহে তরু স্তম্ভিত হইয়া। ॥

দেখি পুনঃ ক্ষণে ক্ষণে, মিলে অনিলের সনে,
হেলিয়া দুলিয়া কিবা আনন্দিত মনে।
মধুর ঝিলের স্বরে, গাইতেছ প্রেম ভরে,
গুণের গৌরব কার বিজন কাননে।
বল না বল না তরু? জিজ্ঞাসি গোপনে ॥

ছাড়ি বিষয়-বিলাস, করি বাসনা বিনাশ,
বনবাসী, কাটি সুখে মমতার পাশ।
সদাই একান্ত মনে, ধ্যান করে যোগিগণে,
কাঁহারে? করিয়া রোধ নিশ্বাস প্রশ্বাস।
কার ভাবে তব তলে তাঁদের নিবাস? ॥

আহা কি ভাব তোমার, হ'ল বুঝে উঠা ভার,
যে বুঝেছে করেছে সে তব তল সার।
প্রভাতে প্রেমাশ্রু তব, পাতায় পড়িছে সব,
ঝর ঝর রবে ঝরে দেখি চমৎকার।
না বুঝে নির্ব্বোধে বলে, "নিশির নীহার" ॥

ভোগ-ইচ্ছা পরিহরি, যোগ-সিদ্ধি লক্ষ্য করি,
করিছ কি ধ্যান কারো দিবস শর্ব্বরী।
পরিয়া বল্কল-বাস, থাক দেখি বার মাস,
কেন থাক বল তরু কঠোরতা করি।
অন্তরে বহিছে বুঝি আনন্দ লহরী ?

তব প্রকৃতি কোমল, স্থির গম্ভীর সরল,
কার ভাবে মগ্ন হ'য়ে হইলে অচল।
কি তব কঠিন পণ, বাক্য কি কহিতে মন
সরে না ? জিজ্ঞাসু জনে বলিতে সকল।
না পেয়ে এ ভাব ভাবি, ভাবুক বিহ্বল ॥

ভাবে অনুমান হয়, কিংবা হইবে নিশ্চয়,
জীবেরে চৈতন্য দিতে দেব দয়াময়।
তোমার দৃষ্টান্তচ্ছলে, রাখিয়া বিজন স্থলে,
শিখান মনুজ-কুলে ভাব সুধাময়
তোমারি সঙ্কেতে গাই, জগদীশ জয় ॥

চিত্র-পয়ার।

কে বলে শৈশবকাল সুখের সময়।

(কে) মনে বলিব শিশু-সুখে যাপে দিন।
স (ব)ল নহেক দেহ সদা পরাধীন॥
শুকা'(লে) তৃষ্ণায় কণ্ঠ বলিতে না পারে।
ক্ষুধায় (শৈ) শব ব্রতী কান্দয়ে চীৎকারে॥
অনিবার (শ) ঙ্কা যুক্ত, ভীত তাড়নায়।
অন্তরের ভা (ব) তার অন্তরে মিশায়॥
বাসনা করয়ে (কা) রো ডাকিব সকাশ।
রসনার নাহি ব(ল) করিতে প্রকাশ॥
সতত প্রয়াস হয় (সু) ন্দর গমনে।
চরণ অশক্ত, থাকে দুঃ (খে) ধরাসনে॥
জীবন সংশয়, বিনা অন্যের (র) যতন।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান বিষণ্ণ (স) ঘন॥
সজীবে নির্জ্জীব মত বাল্য দোষ (ম) য়।
কে বলে শৈশবকাল সুখের সম(য়)॥

চিত্র-পয়ার।

কে বলে যৌবন হরি-সাধনার নয়॥

(কে)ন খা নিন্দার কাল মধুর যৌবন।
স (ব) হৈতে সমাদৃত তরুণ জীবন॥
বিহ্বল (লে)র বাল্যকাল হইলে বিলয়।
জীবের (যৌ) তুক রূপ যৌবন নিশ্চয়॥
অজ্ঞতার (ব) শীভূত নাহি রয় আর॥
সম্যগ্ দর্শ (ন) জ্ঞান উপজয় তার॥
সহজে নিপুণ (হ)য় শাস্ত্রের বিচারে।
অনায়াসে যুক্তি ক(রি) বুঝিবারে পারে॥
প্রখর জ্ঞানের তেজ (সা)হস বিপুল।
বুদ্ধিবৃত্তি, চতুরতা, বো(ধ) অনুকূল॥
হিতাহিত সুবিচার ত্রুটি (না) হি তায়।
জ্ঞানেতে ইন্দ্রিয় বশ কিবা আ(র) দায়॥
দম্ভ অহঙ্কার নাশে করিয়া বি(ন)য়।
কে বলে যৌবন হরি সাধনার ন(য়)॥

চিত্র-পয়ার।

কে বলে বার্দ্ধক্যে লোকে হয় জ্ঞানবান্।

(কে) বা না বুঝিতে পারে জ্ঞানদীপিকায়।
যৌ(ব)ন হইলে অস্ত হীনকান্তি কায়॥
না চ (লে) সরল ভাবে বিষয় সকল।
মনের (বা)সনা সব নিয়ত বিকল॥
এইত বা (র্দ্ধ)ক্য কালে ক্ষীণেন্দ্রিয়গণ।
অনর্থক বা(ক্যে) সদা প্রিয় আলপন॥
অশেষ সুখের (লো)ভ বাড়ে দিন দিন।
চিন্তায় মগন থা(কে) হইলে প্রাচীন॥
সদা আশা সুতাদির (হ)বে বহু ধন॥
তখনো নিজের মৃত্যু হ(য়) না স্মরণ॥
বিষয়ের সুখে তবু অব(জ্ঞা) না হয়।
কোথা তার হরিপদে স্থির ম(ন) রয়॥
কোথায় তপস্যা তার সুবৈরাগ্য(বা)ন্।
কে বলে বার্দ্ধক্যে লোকে হয় জ্ঞানবা(ন্)॥

চিত্র-পয়ার।

কে বলে প্রাচীনকালে সাধন বিধান ॥

(কে) জানে কে কত দিন ধরিবে জীবন।
কে (ব) ল মনের আশা আয়ুর গণন ॥
সলি (লে) বিম্বের মত জীবন নিশ্চয়।
কিরূপে (প্রা)ণের আশা দীর্ঘ দিন হয় ॥
নীরবে অ(চি)ন্ত্য কাল দেয় দরশন।
জীবের মন(ন) পূর্ণ না হয় তখন ॥
কি আছে ভরসা (কা)র, কখন কি হয়।
বার্দ্ধক্য আসিবে ব'(লে) বিলম্ব কি সয় ॥
শিশু যুবা বৃদ্ধ সব (সা)মান্য গণন।
কালের নাহিক কাল নি(ধ)ন কারণ ॥
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই জীব(ন) সংশয়।
কিরূপে বার্দ্ধক্যে তবে আশার (বি)ষয় ॥
যৌবনে সাধনে জীব হবে সাব (ধা)ন।
কে বলে প্রাচীন কালে সাধন-বিধা(ন) ॥

চিত্র-পয়ার।

হরি-পদ-কোকনদ যে করে সাধন।
সফল জনম তার সফল জীবন॥

(হ) উক অতুল তব কীর্ত্তি যশ ধ (ন)।
ক (রি) কি কুরঙ্গ থাক্, তুরঙ্গ, ভ(ব)ন॥
পাও (প)দ সমুন্নত সুদীর্ঘ (জী)বনে।
হও বা (দ)লাধিপতি প্রব (ল) ভুবনে॥
থাক্ রাজ (কো)ষ তব, কি (ফ)ল বা তায়।
দুরন্ত অন্ত(ক) এলে (স) কল বৃথায়॥
তাই বলি মূঢ় (ন)(র) ভজ অনুক্ষণ।
ত্রিজগতের পি (তা) (দ) য়ালের চরণ॥
কেহ নাই স(ম) তাঁর, (যে) রূপ তাঁহার,
শ্রবণ মনন(ন) বিনা কে (ক)রে নির্দ্ধার॥
যম বি (জ)য়ের মন্ত্র কর (রে) গ্রহণ।
কেব(ল) পিয়রে হরি নাম র (সা) য়ন॥
বি (ফ)লে শরীর যেন হয় না নি(ধ)ন।
(স) দাই ভজ রে জীব সাধনের ধ (ন)॥

চিত্র-পয়ার।

রবে না ভবের সব ভাবিয়া দেখ না।
সদা কর মন মুম হরির সাধনা॥

বিষম বিষয় (র) (স) পান করি মন।
বিলাস বিভ(বে) দেখি (দা)রুণ মগন॥
জান না কি (না)হি রবে লো(ক) সমুদয়।
করিবে (ভ)য়াল কাল সংহা(র) নিশ্চয়॥
কি ত(বে) ভাবিছ বল মায়াতে (ম) গন।
ঘো(র) বিষয়ানুরাগে কি কর ম (ন) ন॥
(স) ত্য এ সংসার, মৃগে মরীচিকা ভ্র (ম)॥
(ব) ন্দী হ'য়ে সহিতেছ যাতনা বিষ (ম)॥
স্ব(ভা)ব ভুলিয়া ভ্রান্ত হইতেছ (হ) ত।
বৃথা (বি) ষ পানে কেন নাশে প (রি)ণত॥
মহামা(য়া) মাত্র মিথ্যা ভব (র)চনায়।
ভেবে মন (দে) খ এই সং(সা)র বৃথায়॥
হরি পদে রা(খ) মন (ধ)র ধ্যানযোগে।
জড়িত হ'য়ো না (না) (না) বৃথা কর্ম্মভোগে॥

পিতার নিকট সন্তানের প্রার্থনা।

প্রণমি গো পিতঃ, তব পদে বার বার।
মনের পরম সাধ পূরাও আমার ॥
নাহি চাই মূল্যবান্ চিকণ বসন।
না চাই বলয়, হার, স্বর্ণের ভূষণ ॥
নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন না চাই।
শোভন পাদুকা কিংবা ছত্রে কাজ নাই ॥
নাহি চাই গজ, বাজী, রথ, পারিষদ।
কাজ নাই "রাজা," "রায়বাহাদুর" (১)পদ ॥
ভারতে জন্মিছি, আমি আর্য্যের কুমার (২)।
আর্য্যের পবিত্র পদ প্রার্থনা আমার ॥
"শীলতা" বসন দাও করি পরিধান।
দাও "জ্ঞানামৃত" দাও করি সুখে পান ॥
"ভাগবতী মতি" ছত্র দাও শিরে ধরি।
"সৌজন্য" পাদুকা দাও পদ রক্ষা করি ॥
"স্বধর্ম্ম" উষ্ণীষ(৩) দাও শিরে সাজাইয়া।
"নীতি-রত্নমালা" গলে দাও পরাইয়া ॥

বালিকাগণ (১) "রাজা রায়বাহাদুর" স্থলে "রাণী কিংবা মহারাণী," (২) "আর্য্যের কুমার" স্থলে "কুমারী তোমার" এবং "উষ্ণীষ" স্থলে "মুকুট" পাঠ করিবে।

"সাধু-সঙ্গ" রথ দাও করি আরোহণ।
"বিদ্যা" পথ দিয়া সুখে করি বিচরণ॥
দাও করে "আর্য্য শাস্ত্র" বিজয় নিশান।
দাও শিখাইয়া "আর্য্য ধর্ম্ম" গুণ গান॥
আর্য্যের পবিত্র বল বুদ্ধি, বীর ভাব।
দাও, দাও আর্য্য বিদ্যা বিশুদ্ধ প্রভাব॥
করযোড়ে নতশিরে বলি বার বার।
শিখাও আর্য্যের রীতি নীতি ব্যবহার॥

বালক-বালিকাগণের সংকল্প।

পরনিন্দা, চাতুরী কি চুরি নাহি করিব।
দুর্ব্বল পীড়িত জীবে কভু নাহি মারিব॥
মিথ্যাকথা, কটুভাষা কখন না কহিব।
পর উপকার তরে সব দুঃখ সহিব॥
সুবোধ সুশীল, শান্ত নম্র হ'য়ে রহিব॥
পিতামাতা গুরুজনে সদা ভক্তি করিব॥
ভাই, ভগ্নী, মিত্র জন গণে ভাল বাসিব।
তারা সুখী হ'লে সুখ-সাগরেতে ভাসিব।

অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগিগণে দয়া করিব।
মন্দ পথে গেলে কেহ তাহাকে নিবারিব॥
সুবোধ শিশুর সঙ্গে সাধু বিদ্যা শিখিব।
ভাল উপদেশ যত সব মনে রাখিব॥
পবিত্র-চরিত্র হ'ব সত্য কথা বলিব।
সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম পথে সদা চলিব॥
ভারতের ভাব রসে মগ্ন হ'য়ে যাইব।
ভারতের জয়ধ্বনি উচ্চস্বরে গাহিব॥
ভারতে লয়েছি জন্ম ভারতেরি থাকিব।
ভারতীয় ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব শিখিব॥

বালক-বালিকাদিগের প্রার্থনা

আমরা অবোধ শিশু প্রকৃতি তরল।
কৃপা করি দেহ হরি চরণ কমল॥
প্রহ্লাদ চরিত্র পড়ি' বাড়িয়াছে আশা।
বালকের প্রতি (১) তব বড় ভালবাসা॥

(১) বালিকাগণ 'বালকের প্রতি' স্থলে "আমাদের প্রতি' পাঠ করিবে।

ধ্রুবের জীবন-বৃত্ত পড়ি' বার বার।
শিশুকে সদয় তুমি জানিয়াছি সার॥
রাখিতে কুশলে শিশু দীন-দয়াময়।
পিতা মাতা হৃদে কর স্নেহের উদয়॥
পড়িয়া অজ্ঞানচক্রে ঘুরি নিরন্তর।
শুদ্ধ বুদ্ধি বিনা সদা হ'তেছি কাতর॥
কুকার্য্যে না হয় রতি দেহ এই মতি।
নীতি-জ্ঞান দেহ শিক্ষা জগতের পতি॥
পরস্ব লইতে যদি ইচ্ছা মম হয়।
"সদাই জাগ্রত তুমি" যেন মনে রয়॥
মিথ্যা কিংবা প্রবঞ্চনা চিত্ত যদি চায়।
অথবা কপটাচারে মন যদি ধায়॥
"তুমি অন্তর্য্যামী হরি দেখিতেছ সব!"
এই কথা মনে যেন হয় অনুভব॥
আসিছে সম্মুখে কাল বিষম যৌবন।
মলিন না হয় যেন হৃদয়, নয়ন॥
পিতা মাতা জ্ঞানদাতা আদি গুরুগণে।
সেবা করি, তুষি যেন বিনয়-বচনে॥
সুচারু চরণে তব ভক্তি যেন রয়।
এই মাত্র আমাদের ভিক্ষা দয়াময়॥

নীতি ও ধর্ম্ম সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

তুমি ধন্য, তুমি পূর্ণ, তুমি পুণ্যরূপ হে।
তোমারই প্রতাপে চলে চরাচর, তুমি ত্রিভুবন ভূপ হে,
আমরা অবোধ বালক যত, আসিয়াছি শুনি তব সদাব্রত।
সাধু জ্ঞানিগণে গায় হে সতত, মহিমা যে অপরূপ হে॥
করযোড়ে তাই করি হে ভিক্ষা, গুরু রূপে দেও সুনীতি শিক্ষা,
ভারতীয় ভাবে দেও হে দীক্ষা, রক্ষাং কুরু চিদ্‌রূপ হে॥ (১)

রাগিণী পাহাড়ী, তাল আড়াঠেকা।

কোলে লও ভারত মাতা শিশু পুত্রগণে (ক) গো।
আর্য্যগণের প্রস্থতি, প্রণমি চরণে গো॥
কত যে মহিমা তব, বিভব আর কত ক'ব,
করযোড়ে করে স্তব, সর্ব্বদেশী জনে গো॥
পান করি' তব স্তন্য, ত্রিজগতে হব মান্য,
জীবন করিব ধন্য, নীতি ধর্ম্ম জ্ঞানে গো॥
তোমারই ঐশ্বর্য্য ল'য়ে, তোমারই মঙ্গল গেয়ে,
তোমারই সেবক (খ) হ'য়ে, ভ্রমিব ভুবনে গো॥ (২)

বালিকাগণ গাইবে—
(ক) "পুত্রগণে" স্থলে "কন্যাগণ"।
(খ) "সেবক" স্থলে "সেবিকা"।

ঝিঁঝিট, একতালা।

কে হে তুমি পূর্ব্ব আকাশ বিনোদ বিকাশ কারী।
তিমির-বারণ অরুণ বরণ তরুণ কিরণ ধারী॥

১। ময়ূখমালা প্রসারিলে, নিশি তমোরাশি বিনাশিলে,
জগতের যত জীব জাগাইলে, জয় জয় তোমারি॥

২। ধরিবার ধারা প্রেমানুরাগে, দেখে উষা তাই ধাইছে বেগে,
মুখে হাসি জাগে, লাজে যায় আগে, তোমারি কুমারী॥

৩। অপরূপ রবি, ছবির ছটা, প্রকৃতি মা'র মুখে হাঁসির ঘটা,
যেন মা'র ভালে সিন্দুর ফোটা, ভূষিত বলি হারি॥

৪। তুমি হে পতিত-পাবনগতি, তুমিই জগৎ জীবের গতি,
পরিব্রাজক তাই করিছে প্রণতি, সরসিজ মনোহারী॥৩॥

ঝিঁঝিট, একতালা।

নারায়ণ, পরমব্রহ্ম, ভক্তভয়ভঞ্জন।
করুণার্ণব, দেবদেব, সেবকজনরঞ্জন।

১। এসো এসো হরি কমলাকান্ত, তাপিত প্রাণ করহে শান্ত,
ঘোর আঁধারে আমরা ভ্রান্ত, ধ্বান্তবিনাশন॥

২। ডাকিছে দীনদাসগণে, এসো ব'সো হৃদি কমলাসনে,
তোমারই পূজন তরে আয়োজন, কুরু কৃপা দীনতারণ॥

৩। হেরি হরি তব অভয় পদ, দূরে যায় শোক রোগ বিপদ,
পরিব্রাজকের সার সম্পদ, মান-মদ-মোদ-মর্দ্দন॥৪॥

রাগিণী বিভাস—একতালা।

নমস্তে, ত্রিলোক-তারণ, বিশ্বমনোরঞ্জন।
ওহে ভারতে তোমার মহিমা প্রচার করহে আবার এই নিবেদন॥
আর্য্যকুলে জন্ম করিছি গ্রহণ, আর্য্য রীতি নীতি নাহিক স্মরণ,
অনার্য্য আচারে কলুষিত মন (দয়াময় হে) আর্য্যরবে দেশ কর সচেতন
ভক্তি সরলতা জ্ঞান ধর্ম্মনীতি, প্রচারি জগতে হর হে দুর্গতি,
নরনারী বৃদ্ধ বালক যুবতী (হৃদয়ে হে) স্বধর্ম্ম সুমতি করহে প্রেরণ॥
তব জয়গানে মাতিবে ভারত, তবোদ্দেশে হবে দেশ হিতে রত,
পরিব্রাজক ঐ চরণে প্রণত, (দয়াময় হে) সফল হয় যেন
জনম জীবন ॥৫॥

রাগিণী পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

এ সময়ে আর্য্যগণ, রহিলে কোথায় হে।
সোণার ভারত-ভূমি রসাতল যায় হে॥
এসো এসো ব্যাস বশিষ্ঠ, বাল্মিকী তাপস শ্রেষ্ঠ,
এসো শুক ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভারত সহায় হে॥
এসো এসো ভৃগুমুনি, এস পাণ্ডব চূড়ামণি,
এসো জনক তত্ত্বজ্ঞানী, ত্রাহি বিষম দায় হে॥
করিছি শাস্ত্রে শ্রবণ, ধর্ম্ম ভারতের প্রাণ,
সেই সার নিত্য ধন, ভারত হারায় হে॥
পরিব্রাজকের উক্তি, নাই ভারতে সে ভাব ভক্তি,
কপট জ্ঞান যোগে যুক্তি, রত কুচিন্তায় হে ॥৬॥

পাপ ও পুণ্যের বিবাদ ।

(সুর—বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের)

পুণ্য পাপের বিষম বিবাদ লোক সমাজে ।
লোক সমাজে লোক সমাজে বিশ্বমাঝে
লোক সমাজে ॥

পাপ বলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে ।
পুণ্য বলে রাজ্য আমার সাধু হৃদ্‌নগরে
পাপ্ যেতে নারে ॥

পাপ বলে আমার ডঙ্কা বাজিছে সঘনে ।
পুণ্য বলে সে শঙ্কা নাই ভক্তের ভবনে,
হরি নামের গুণে ॥

পাপ বলে আমায় পূজে বালবৃদ্ধ নারী ।
পুণ্য বলে হৃদয়ে যার গোলোক বিহারী,
তথায় মান আমারি ॥

পাপ বলে হর্ত্তা কর্ত্তা আমি বিশ্ব মাঝে ।
পুণ্য বলে ও কথা কি আমার কাছে সাজে,
বৃথা গর্ব্ব এ যে ॥

পাপ বলে রাখি আমি জীব সকলে সুখে ।
পুণ্য বলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুখে,
পড়ে ঘোর নরকে ॥

পাপ বলে মহামোহ আমার সেনাপতি।
পুণ্য বলে রণস্থলে হরি আমার গতি,
যিনি ত্রিলোকপতি ॥

পাপ বলে কুবাসনা আমার সঙ্গিনী।
পুণ্য বলে সুমতি হন আমার জননী,
পতিত-পাবনী ॥

পাপ বলে রতি হিংসা নিন্দা ভালবাসি।
পুণ্য বলে আমার ভক্ত নয় তাদের প্রয়াসী,
তারা নয় তামসী।

পাপ বলে আমার ভক্ত ধন্য ইহলোকে।
পুণ্য বলে সাধু সুখে চিরদিন থাকে,
ইহ পরলোকে ॥

পাপ বলে আমার প্রজার সংখ্যা সীমা নাই।
পুণ্য বলে নরক রাশি এত অধিক তাই,
পাপীর ভোগ করা চাই ॥

পাপ বলে আমি ছাড়া কেবা হরি আছে।
পুণ্য বলে তোমার দণ্ড হইবে যাঁর কাছে,
সময় আসিতেছে ॥

পাপ বলে থাকিব না তবে আর এখানে।
পুণ্য বলে এই বেলা যাও অগ্নি মানে মানে,
আমার কথা শু'নে ॥

মিটে গেল পাপ পুণ্যের বিবাদ বালাই।
পরিব্রাজক বলে হরি, হরি, হরি বল ভাই,
সুখে থাকবে সদাই ॥ ৭ ॥

ভোগ ও বৈরাগ্যের সংবাদ।

(সুর—বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের)

জীব জগতে দ্বন্দ্ব অতি ভোগ বিরাগে।
ভোগ-বিরাগে, বিরাগ-ভোগে দ্বন্দ্ব লাগে,
ভোগ-বিরাগে ॥

ভোগ বলে—এ সংসার সুখের বাজার,
বৈরাগ্য বলে—মরুভূমে মরীচিকা সার,
এ সব মায়ার বিকার।

ভোগ বলে—আমার সব এই স্ত্রী কন্যা তনয়,
বৈরাগ্য বলে—যা দেখ সব পথের পরিচয়,
এরা কেউ কারও নয়।

ভোগ বলে—লাবণ্যময় মধুর যৌবন,
বৈরাগ্য বলে—মেঘের কোলে চঞ্চলা যেমন,
থাকে ক'দিন তেমন?

ভোগ বলে—কত সুধা রমণী অধরে,
বৈরাগ্য বলে—বড়িশ-পিণ্ড যেন সরোবরে,
মৎস্য মারিবারে।

ভোগ বলে—দেহের সজ্জা করি পরিপাটি,
বৈরাগ্য বলে—জীবের দেহ কেবল ময়লা মাটি,
বৃথা আঁটাআঁটি।

ভোগ বলে—কোমল শয্যায় শয়ন করি সুখে,
বৈরাগ্য বলে—শ্মশান-শয্যা মনে যেন থাকে,
দিবে অগ্নি মুখে।
ভোগ বলে—রাখি রথ গজ বাজী দ্বারে,
বৈরাগ্য বলে—মুদ্‌লে আঁখি সব ফাঁকি যে পরে,
মায়ায় ভুল' না রে।
ভোগ বলে—সম্মান পাই রাজার দরবারে,
বৈরাগ্য বলে—কি হবে যম রাজার দুয়ারে,
তা কি ভাব না রে?
ভোগ বলে—বহু দাস দাসীর প্রভু হই,
বৈরাগ্য বলে—আর কে প্রভু জগৎ-প্রভু বই
জীবের প্রভুত্ব কৈ?
ভোগ বলে—অতুল ধনের আমি অধিকারী
বৈরাগ্য বলে—নিদান কালে কলসী কাচাধারী,
ঘুচ্‌বে জারি জুরি।
ভোগ বলে—তবে কি সব কিছুই কিছু নয়,
বৈরাগ্য বলে—সব ফাঁকি এ ভোজের বাজীময়,
চিরদিন নাহি রয়।
বৈরাগ্যের বচনে ভোগ হৈল হতমান;
পরিব্রাজক বলে কর সবে হরিগুণ গান॥
হবে ভোগ অবসান॥৮॥

পরিশিষ্ট।

সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার বিধি ও ব্যবস্থা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অবতরণিকা।

গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এতদাশ্রমত্রয়েব সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথা যে দিন হইতে আর্য্যভূমি ভাবতবর্ষকে পবিহাব করিয়াছে, সেই দিন হইতে এই পুণ্যভূমি শারীরিক দুর্ব্বলতা, দুবাগ্রহ, দুর্ব্ব্যবহাব, ভ্রষ্টাচাব, ভীরুতা, চপলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা আদি মানসিক মলিনতা ও ক্ষীণতার প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃস্মবণীয় আর্য্যগণেব প্রভুত্বকালে বর্ণানুসারে ধর্ম্মনীতি, বাজনীতি, সমাজনীতি ও বিবিধ সাধাবণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসিগণ তপোবল, ধর্ম্মবল, বিদ্যাবল, বাহুবল, ধনবল আদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি উপার্জ্জন পূর্ব্বক এই পবিত্র ভূমিকে সভ্য-সমাজচূড়ামণি করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানেব অভাবে সুকুমারমতি বালকগণ স্বেচ্ছা ও যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া বহুল দুঃখদুর্গন্ধময় জীবন লাভ কবতঃ পুণ্যশীল ভারতীয় সমাজকে কলঙ্কিত ও উপদ্রবগ্রস্ত করিতে প্রবৃত্ত ও স্বয়ং পরিণাম-দুঃখাবহ দুর্ব্বহ দুর্দ্দশার ভার গ্রহণে অন্ধের ন্যায়

ধাবমান হইতেছে দেখিয়া "ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা"* ভবিষ্যৎ ভারতের পরম হিতসাধনার্থ স্নেহ-ভাজন কোমল-হৃদয় তরলমতি বালকবর্গকে কল্যাণ-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় সুখী করিবার নিমিত্ত "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" স্থাপনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর বালকবর্গের কোমল হৃদয় স্পর্শ করিয়া ভারতের মঙ্গল বিধান করুন। স্বর্গ-নিবাসী আর্য্যমহাত্মগণ নিজ নিজ তৈজস শক্তি সহ ভারতের হৃদয়-তন্ত্রী আকর্ষণ করুন।

সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার নিয়মাবলী।

১। প্রতি সপ্তাহে একদিন [যে দিন স্থানীয় বালকবর্গের ও উপদেষ্টার সুবিধা বোধ হইবে] অন্যূন দুই ঘণ্টার জন্য এতৎসভার নিয়মিত অধিবেশন হইবে।

২। অন্যূন দ্বাদশ-বর্ষ-বয়ঃ-প্রাপ্ত ও ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বি-কুল-জাত না হইলে কাহাকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে না। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকগণ সভায় আসিয়া উপদেশ শুনিতে পারিবে মাত্র।

৩। সভ্যগণ সভামধ্যে ভদ্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট হইবেন। যাঁহাদের বয়স পঞ্চদশ বর্ষের ঊর্দ্ধ নহে, তাঁহারা এক দিকে এবং তদূর্দ্ধবয়ঃ-প্রাপ্ত সভ্যগণ অপর দিকে বসিবেন।

৪। সভার কার্য্যারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন সভ্যই তাম্বুল-

---

* এই সভা পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাঁহারই জীবনের সঙ্গে ইহা তিরোহিত হইয়াছে।

সেবন, পরস্পর হাস্য-পরিহাস, সভার কার্য্য-সম্পর্কশূন্য বার্ত্তালাপ ও সভার কার্য্যে অমনোযোগ প্রদর্শন করিবেন না।

৫। প্রত্যেকেরই সভার কার্য্যার্থ প্রতিমাসে অন্যূন এক পয়সা করিয়া বৃত্তি দান করিতে হইবে।

৬। এক জন কৃত-বিদ্য সচ্চরিত্র, সদুৎসাহী, বাক্‌চতুর, আর্য্যধর্ম্ম-পরায়ণ পুরুষ উপদেষ্টৃ পদে নিযুক্ত থাকিবেন।

৭। যাহাতে সভ্যগণ নিজ নিজ চরিত্র বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা করিতে ও আর্য্য-ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারেন, এই সভায় তদুপযোগী উপদেশ প্রদত্ত হইবে। যাহাতে আর্য্য-ধর্ম্মানুকূল রীতি নীতি সভ্যগণের হৃদয়গম্য হয় ও তাঁহারা তত্তাবতের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, সরল-ভাবযুক্ত ঈদৃশী শিক্ষার দিকে উপদেষ্টা বিশেষ রূপ মনোযোগী থাকিবেন।

৮। বালকদিগেরই মধ্য হইতে এক জন এতৎসভার কার্য্য-সম্পাদক ও এক জন সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন।

৯। সম্পাদক নিজ ভাষাতে সভার সাপ্তাহিক কার্য্য-বিবরণ লিখিবেন ও সভার প্রয়োজন মত বিজ্ঞাপনাদি দিতে ও অন্যত্র পত্রাদি লিখিতে হইলে স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইবেন।

১০। সহকারী সম্পাদক, কার্য্য-সম্পাদকের অনুপস্থিতিকালে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন। তিনি "কোষাধ্যক্ষ" হইয়া বালকগণের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি সংগ্রহ ও রক্ষা করিবেন এবং সভ্যগণের সম্মুখে ধনের আগম ও ব্যয়াদির একটী করিয়া ত্রৈমাসিক বিবরণ-পত্র প্রদান করিবেন।

১১। সংগৃহীত ধন এতৎসভার জন্য কাগজ, লেখনী, পুস্তক বা বিশেষ প্রয়োজন হইলে অন্য কোন কার্য্যার্থ ব্যয়িত হইবে।

১২। আবশ্যক হইলে সভ্যমণ্ডলীর অনুমোদনানুসারে প্রতি বর্ষে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবেন।

১৩। প্রতি সপ্তাহেই একটী একটী সভ্য পর্য্যায়-ক্রমে উপদেষ্টা মহাশয়ের আদেশানুসারে নীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া সভায় পাঠ করিবেন। অন্যূন চারি সপ্তাহ পূর্ব্বে লেখককে প্রবন্ধের বিষয় বাচনিক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

১৪। প্রবন্ধ নিজ ভাষাতে লিখিত হইবে ও উপদেষ্টা উক্ত ভাষাতেই উপদেশ দান করিবেন।

১৫। অপরিহার্য্য বিঘ্ন বা বাধা ভিন্ন সভ্যমাত্রকেই প্রতি অধিবেশনে সভায় উপস্থিত হইতে হইবে। আসিতে না পারিলে, না আসিবার কারণ লিপি বা লোক দ্বারা সভাকে জানাইতে হইবে।

১৬। যদি কোন সভ্যের চরিত্র বা প্রকৃতি দূষিত হইয়াছে শ্রুত হওয়া যায়, তবে তাঁহাকে এক মাস কাল তৎ-সংশোধনের জন্য অবকাশ ও শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহাতেও যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তিনি সভায় আসিয়া প্রতি সপ্তাহে নৈতিক শিক্ষাদি লাভ করিতে পারিবেন, কিন্তু সভ্য শ্রেণীর মধ্য হইতে তাঁহার নাম কর্ত্তিত হইবে। পুনরুন্নতি লাভ করিলে, নাম পুনর্ল্লিখিত হইবে।

১৭। কোন সভ্যই গাঁজা, গুলি, আফিং, চরস, সিদ্ধি, মদ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারিবেন না। [চিকিৎসক-দত্ত ঔষধের সহিত কোন মাদক দ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে, এ নিয়ম

তাহার বাধা করিবে না] যাঁহারা তামাকু পর্য্যন্ত সেবন করিবেন না তাঁহারা আরও প্রশংসনীয় হইবেন।

১৮। কোন সভ্যই ব্যায়ামকর ক্রীড়া ভিন্ন, তাস, পাশা, দাবা, জুয়া আদি খেলিবেন না।

১৯। সভার অধিবেশনকালে সকল সভ্যই প্রথমতঃ উপদেষ্টা মহাশয়ের সহিত সমবেত-স্বরে ক্রমান্বয়ে (ক) চিহ্নিত ভগবানের ও (খ) চিহ্নিত গুরুদেবের প্রণাম পাঠ ও নমস্কার করিবেন। তৎপরে দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষবয়স্ক বালকবৃন্দ "বালকগণের সঙ্কল্প"* পাঠ করিবেন ও তদূর্দ্ধবয়স্ক সভ্যগণ তাহা স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিবেন। তদনন্তর কার্য্য-সম্পাদক-কর্ত্তৃক সভ্যগণের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি আদি লিপিবদ্ধ ও তৎপূর্ব্বাধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে নিরূপিত-সভ্য-কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হইবে। তদবসানে, লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সভ্যমণ্ডলী নিজ নিজ মন্তব্য ব্যাখ্যা করিবেন এবং উপদেষ্টা মহাশয় সেই বিষয়ের বিশেষ উপদেশ ও সভ্যগণের মতভেদ থাকিলে তাহার সমাধান করিয়া দিবেন। তাহার পর শিশুগণ কর্ত্তৃক "বালকদিগের প্রার্থনা"টী † সমবেত স্বরে পঠিত হইবে। পরিশেষে উপদেষ্টা ও সমস্ত সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে (গ) চিহ্নিত স্তুতি পাঠ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে নমস্কার করিবেন।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইবে।

* ৯৫ পৃষ্ঠা। † ৯৬ পৃষ্ঠা।

সভ্যগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। সভার কোন বিশেষ বিষয় জানিতে হইলে ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভায় পত্র লিখিবেন।

২। কোন স্থানীয় সুনীতি-সঞ্চারিণী সভার কোন সভ্য, বা সহায়ক অথবা সহানুভাবকের উৎসাহে বা যত্নে যদি কোন নূতন সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হয় তাহাও উপরিউক্ত নিয়মানুসারে চালিত হইবে। সভা স্থাপিত হইলেই ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার কার্য্য-সম্পাদক মহাশয়কে পত্র দ্বারা বিদিত করিতে হইবে! তিনি এতৎসংবাদ "ধর্ম্ম প্রচারক" পত্রে প্রকাশ করিবেন।

৩। যে সকল সভ্যের কর্ণবেধ বা উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে তাঁহারা নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত বা গুরূপদেশমত দৈনিক সন্ধ্যা বা ঈশ্বরোপাসনা করিবেন।

— —

পরমেশ্বরের নমস্কার। (ক)

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"

(ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু দিব্য দিব্য স্তবের দ্বারা যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন, সাঙ্গোপাঙ্গ পদ ক্রম ও বেদোপনিষদাদি

সহযোগে সামগাথাগায়কবৃন্দ যাঁহার মনোহর গুণ গান করিয়া থাকেন, ধ্যানাবলম্বিভাবস্থায় তদ্গত-চিত্ত যোগিগণ যাঁহার অপূর্ব্ব দর্শন লাভ করেন এবং দৈব দানব কেহই যাঁহার সীমা বা সম্পূর্ণ তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ নহে, সেই পরম দেবতাকে নমস্কার করি।)

গুরুর প্রণাম। (খ)

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥"

(গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ও আনন্দস্বরূপ, বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন পরম সুখদাতা, তিনি একমাত্র ও প্রকৃত জ্ঞানমূর্ত্তি, দ্বৈত-বুদ্ধির অগম্য, আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত ও নির্ম্মল; "তৎ+ত্বম্+অসি" এই তিন মহাবাক্যের লক্ষ্য পরম পদার্থ; তিনি এক, নিত্য, নির্ম্মল, ও নিশ্চল, ও জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায় সাক্ষি-স্বরূপ, তিনি ভাবাতীত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রহিত; সেই সৎস্বরূপ গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি।)

স্তব। (গ)

দেববৃন্দ-বন্দ্য, ভব-সিন্ধু-সেতো,
অনন্ত প্রশান্ত গুণত্রয়াতীত।
ত্বং বিশ্ববিধাতা, কৃপাপার-সিন্ধো,
ভবন্তং নমামি প্রভো! দীনবন্ধো ॥১॥
মদীয়োঽন্তরাত্মা যথা ধর্ম্মমার্গে
প্রবর্ত্তেত নিত্যং তথা ত্বং বিধেহি।
সহায়শ্চ নিত্যং ভব ত্বং মদীয়ো
ভবন্তং নমামি প্রভো দীনবন্ধো ॥২॥
বচো মে ক্রিয়া মে তথা ভাবনা মে
সদা সাধুতালঙ্কৃতা দোষহীনা।
যথা স্যাত্তথা ত্বং বিধেহীতি বাঞ্ছা
ভবন্তং নমামি প্রভো! দীনবন্ধো ॥৩॥
ন জানামি ভক্তিং ন জানামি পূজাং
কথং বা ভবন্তং সমারাধয়ামি।
স্বকীয়ৈর্গুণৌঘৈঃ কুরু ত্বং শুভং মে
ভবন্তং নমামি প্রভো! দীনবন্ধো ॥৪॥

হে সুরগণ বন্দনীয়, হে সংসার-সিন্ধুর সেতুস্বরূপ, হে

অনন্ত, হে শান্ত, হে ত্রিগুণাতীত, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা, হে অপার করুণাসিন্ধো, হে প্রভো, হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যাহাতে আমার অন্তরাত্মা সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত থাকে, তুমি তাহাই বিধান কর। তুমি আমার সহায়ক হও, হে প্রভো, হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

আমার বাক্য, আমার অনুষ্ঠান ও আমার চিন্তা যেন সদা সাধুভাব-যুক্ত ও নির্ম্মল হয়, তুমি এইরূপ বিধান কর, ইহাই আমার প্রার্থনা। হে প্রভো, হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

ভক্তির লক্ষণ কি, তাহা আমি অবগত নহি, তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম পূজার বিধি কি তাহাও আমি জানি না, অতএব কিরূপে আমি তোমার আরাধনা করিব ? তুমি নিজগুণেই আমার কল্যাণ বিধান কর। হে প্রভো, হে দীনবন্ধো, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

—০—

সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা।

প্রশ্ন। তোমাদের সভার নাম কি ?

উত্তর। "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা"।

প্র। নীতি শব্দের অর্থ কি ?

উ। গতি বা প্রাপ্তিকে নীতি কহে, অর্থাৎ যে কৌশলে

কোন কার্য্যের ফল সুশৃঙ্খলে প্রাপ্ত হওয়া বা লাভ করা যায় তাহার নাম "নীতি"।

প্র। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

উ। যে উপায়ে রাজা রাজকার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার নাম "রাজনীতি"; যে উপায়ে সমাজ সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হয়, তাহার নাম "সমাজনীতি"; যে উপায়ে যুদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম "সমরনীতি", যে প্রণালীতে গৃহের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম "গার্হস্থ্যনীতি"; যে উপায় দ্বারা মনুষ্যগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন পূর্ব্বক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ভগবানের চরণ-কমল লাভের উপযোগী হইতে পারেন, তাহার নাম "ধর্ম্মনীতি"; ইত্যাদি।

প্র। তোমাদের সভার নামে "নীতি" না দিয়া "সুনীতি" দেওয়া হইল কেন?

উ। যাহাতে লওয়ায় বা প্রাপ্ত করায়, তাহাই "নীতি"। সকল কার্য্যেরই নীতি আছে। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, দুষ্কর্ম্ম করা আদিরও মূলে নীতি আছে, কিন্তু তাহাকে দুর্নীতি কহে। যে পথ অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে সুপথে লইয়া যায় বা সুফল দান করে, তাহার নাম সুনীতি। সু-শিক্ষাই আমাদের সভার উদ্দেশ্য, এই জন্য "সুনীতি" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্র। "সঞ্চারিণী" শব্দের অভিপ্রায় কি?

উ। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনের নাম "সঞ্চরণ"। এই সভা দ্বারা শাস্ত্রীয় সদুপদেশরাশি উপদেষ্টগণের মুখ হইতে

আমাদিগের কর্ণে, ও কর্ণ হইতে হৃদয়ে, ও হৃদয় হইতে আমাদিগের প্রকৃতিতে, এবং প্রকৃতি হইতে আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে সঞ্চারিত হইবে। আবার আমাদিগের কার্য্য দেখিয়া অন্যান্য বালকবর্গের প্রকৃতি আদিতে সঞ্চারিত হইয়া পরিশেষে সমস্ত ভারতে ও জগতে সঞ্চারিত হইবে। এই জন্য এই সভার নাম "সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা" হইয়াছে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান শতাব্দীর শিক্ষা-প্রণালীর তুলনা করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, এক্ষণে ইউরোপীয় রীতিতে সুশিক্ষিত হইতে গিয়া যুবকগণ শিক্ষোপযোগী প্রধান প্রধান বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে বিস্মৃত ও বঞ্চিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী বাহ্য-রূপমাধুরীতে তরুণ বয়স্কগণকে বিমোহিত করিয়া, শিল্প-নৈপুণ্য বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধন-সম্পত্তি আহরণ ও পদার্থ-বিদ্যাভিমুখে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। এতাবৎ মানবের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও প্রধানতম বিষয়গুলির অভাবে পরম সুখোৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না। ধর্ম্মজ্ঞান ও সুনীতিই সর্ব্ব সুখের আকর ও পরম সম্পদের ভিত্তিস্থান। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর সহিত এই দুইটীর আদৌ কোন বিশেষ সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুইটীর অভাবই ভারতীয় বর্ত্তমান কৃতবিদ্যগণকে অশিক্ষিতগণের অপেক্ষাও প্রতিষ্ঠাশূন্য কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া অত্যন্ত অপ্রতিপত্তি-

ভাজন ও সমাজের আবর্জ্জনা বা পাংশুরাশি সদৃশ অপদার্থ করিয়া তুলিতেছে।

আজকাল যে সহস্র সহস্র যুবাপুরুষ শিক্ষা-প্রাঙ্গণ সমূহকে উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও বিদ্যাশিক্ষার কোন বিশেষ লক্ষ্য অথবা জীবনের কোন নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনের কর্ত্তব্যানুভূতি আছে কি না, তাহাও সন্দেহ স্থল, সুতরাং তাঁহারা কিরূপে স্বকীয় ও পরকীয় কল্যাণ সাধন করিবেন! তাঁহাদের নিকট হইতে কোন শুভ ফলের আশা করিতে সাহস হইতেছে না, কেননা তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালীই নিতান্ত অপূর্ণ দশাগ্রস্ত। তাঁহারা মনুষ্যত্ব লাভের আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব আদৌ অবগত নহেন ও নিজ নিজ প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্য কি কি প্রয়োজন, তাঁহাদিগকে তাহারও অনুসন্ধান করিতে দেখা যায় না। শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেরই নীতি-জ্ঞান নাই। প্রকৃত-মর্য্যাদা-বোধ ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাঁহাদিগের নিকট হইতে অবকাশ লইয়াছে। তাঁহারা কেবল নিজ নিজ নিকৃষ্ট প্রকৃতির ও বিলাস-সুখের দাসত্ব করিয়া, অথবা স্থূল-বুদ্ধির ন্যায় জড় জগতের উপাসনা করিয়াই দিনপাত করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মানুসন্ধান-লব্ধ অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের জড়বুদ্ধি এত অপরিস্ফুট, যে অনেকে নিজ নিজ পাঞ্চভৌতিক দেহ ভিন্ন আত্মসত্তায় বিশ্বাস করিতেও কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। হায়! আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ এই পুরুষগণকে দোষ দিয়াই বা কি করিব। কেবল উঁহাদেরই নিজ নিজ দোষে যে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা নহে। কিরূপে উচ্চ, উদার, নৈতিক প্রকৃতি লাভ করিয়া প্রকৃত আত্মোৎকর্ষ সাধিত

হয় ও কি উপায়ে স্বর্গীয় সুখ ও দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হয়, এতাবৎ শিক্ষা দিবার জন্য সুদক্ষ সদুপদেষ্টার অভাবই ইহার প্রধানতম কারণ। বিদ্যার্থিবর্গকে সুশিক্ষিত ও তাহাদের ভাবী জীবন গঠনের জন্য পাঠার্থ যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচন করা হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত-সাধক ধাতুতে নির্ম্মিত নহে।

জড় বিজ্ঞান ও পদার্থ-তত্ত্ব-বিদ্যাই অধুনাতন পাঠশালা ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাভূমিতে একাধিপত্য করিতেছে। যাহাতে মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উন্নতি অথবা প্রতিভা লাভের কোন বিশেষ আশা নাই, কিংবা যাহা সম্বল করিয়া কৃতবিদ্য পুরুষগণ কার্য্য-ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ, সেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকর বিষরাশি শিক্ষা দ্বারা, তরুণ বিদ্যাভ্যাসি-গণের চিত্তভূমি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, অথচ তাঁহাদের মনুষ্যত্ব লাভের বা অনন্ত উন্নতি-পথের নিতান্ত অনুকূল উচ্চতম নীতি ও প্রকৃত তত্ত্বসমূহ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ অন্তরালে পড়িয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, উহাদের উপদেষ্টৃবর্গই স্বয়ং তদ্বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, অথবা তাঁহারা ঈদৃশ তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই প্রস্তুত নহেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী ধর্ম্ম-তত্ত্ব জ্ঞান ও নীতি-উপদেশ বর্জ্জিত হওয়ায় মনুষ্যের নির্ম্মল স্বাধীন ভাবের ও তেজস্বিনী শক্তির অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে।

নীতি ও ধর্ম্ম-জ্ঞান শূন্য শুষ্ক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ভারতের প্রাণ-স্বরূপ, সমাজের একমাত্র-গতিস্বরূপ, মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বস্ব তত্ত্ব-জ্ঞানকে পদাঘাত করিয়া আনন্দ-কানন আর্য্যভূমিকে প্রেত-পিশাচ

পূর্ণ মহাশ্মশানক্ষেত্র করিয়া তুলিতেছে। এই শিক্ষাভিমানী দলই আবার তাঁহাদের বংশধরগণের আদর্শ স্থল হইবেন! অহো! তাহা হইলে ভারত নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবে। যে দিন হইতে ঈদৃশ নিরঙ্কুশ শিক্ষা ভারতের ভদ্রগৃহে স্থান পাইয়াছে, সেই দিন হইতেই মদ্যপান, বেশ্যা-সমাগম, অমিতাচার, মিথ্যা-ভাষণ, কপট-ব্যবহার, প্রবঞ্চনাদি দুর্নীতিরাশি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রশ্রয় পাইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আমরা বিনয়পূর্ব্বক পরামর্শ দিতেছি যে, তাঁহারা যদি সন্তানগণের নিকট হইতে নিজ নিজ কল্যাণের আশা করেন, তবে অবিলম্বে তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞানের সুশীতল চরণচ্ছায়ায় রক্ষা করুন, তাহা হইলেই ঘোর কোলাহলকারী জড়তত্ত্বমাত্র-বাদিগণ নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে। মনুষ্য-সমাজ পরিহার করিয়া, তাহারা ইতর জীব-মণ্ডলীতে আপনাদিগের রাজত্ব স্থাপন করিবে। মানবগণ নিষ্কণ্টক হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিপাত করিতে পারিবেন। প্রকৃত পক্ষে উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। শত শত বিপদের শান্তি হইবে, কল্যাণের উপচাররাশি পুঞ্জায়মান বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এই মঙ্গলামৃত-পানে, কেবল শিক্ষক ও শিক্ষিত দল পরিতৃপ্ত হইবেন, এমন নহে; সর্ব্বসাধারণেই ইহার অপূর্ব্ব সুমধুর রস আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হইতে পারিবেন।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে কত শত কর্ত্তব্যবিমূঢ় পিতা মাতাকে শোক-সাগরে ভাসাইতেছে, কত শত যুবকের শরীরকে চিরদিনের ব্যাধি-মন্দির করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে, কত শত লোককে তত্ত্ব-

জ্ঞানবর্জ্জিত করিয়া,তাহাদের জীবনকে দুঃখময় করিয়া রাখিতেছে, কত কত শরীর ও আত্মাকে সদাই বিপদ্ হুতাশনের প্রচণ্ডতাপে বিদগ্ধ করিতেছে, তাহা বলা যায় না। হায়! মিথ্যাত্মক জড়-বিজ্ঞান-প্রণোদিত বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী বর্ত্তমান সমাজকে কি ভয়ানক অযথা পরিমাণে কলুষিত করিয়া দিতেছে। শীঘ্রই এই শিক্ষাপ্রণালীর গতি পরিবর্ত্তিত করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান মিশ্রিত শিক্ষা প্রচলিত হইলেই, ভারতের মলিন মুখ পুনরুজ্জ্বল হইয়া হাস্য-বিকাশে মনোহর রূপ ধারণ করিবে। সুখ ও পুণ্য-পবিত্রতা ভারতের প্রতিগৃহেই নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকিবে। তখন দেখিতে পাইবেন, বিজ্ঞান শাস্ত্র আবার অপূর্ব্ব অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুষ্ট-কলেবর হইবে, এবং আজ কালের বিজ্ঞানের ন্যায় কেবল ইহলোকেই বিচরণ করিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ-তার পরিচয় দিবে না। তখন এই বিজ্ঞান জড়জগৎ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের অলক্ষিত পথে দেবদুর্ল্লভ পবিত্র রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইবে। আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নিত্য-নবীন অপূর্ব্ব বিষয়সমূহের সমাচার বহন করিয়া "বিজ্ঞানশাস্ত্র" জনসমাজকে উন্নত করিতে থাকিবে। অকাতরে ভূলোক স্বর্লোকসুলভ সুখ-সম্পদ্ বিতরণ করিবে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাসমাজের শিরোমণি বৈজ্ঞানিকগণ যাহা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারেন না, সেই অধ্যাত্ম রাজ্যের ও পদার্থ-তত্ত্ব-বিদ্যার অতুল সম্পত্তিরাশির অধিকারী হইয়া জনসমাজ উন্নতির নির্ম্মল উৎসবস্বরূপ পরমাত্ম-সত্তার সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতার্থ হইবে।

বিবাহ।

পুত্রকে যথানিয়মে প্রতিপালন এবং বিদ্যা, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দান এবং তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ সম্পাদনার্থ লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে কি দুঃসময় আসিয়া পড়িয়াছে, বিধাতার কি কুচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে, অল্প বয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া ও পুত্রবধূর মুখ অবলোকন করা পিতামাতার একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে! এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশ বিবিধ প্রকারে বিড়ম্বিত হইতেছে। পুত্রের সুসন্তান উৎপাদন করিবার উপযুক্ত বীজ পুষ্ট হইয়াছে কি না, তাহার বিচার কে করে? পুত্র জড়, অঙ্গহীন, হৃদ্‌রোগগ্রস্ত, কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত, উন্মাদযুক্ত, দুশ্চরিত্র, সমাজের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই! পুত্র নিজের এবং ভবিষ্যৎ পরিবারাদির ভার বহন করিতে পারিবে কি না, তাহা-দিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া সমাজে গণনীয় হইবে কি না, তাহা কে দেখে, কে চিন্তা করে? পুত্রের বিবাহ না দিলেই নয়! লোকে নিন্দা করিবে অপরিণামদর্শী পিতামাতা এই ভয়ে সদাই চিন্তিত। পুত্রের বিবাহ দেওয়া মহা দায় বলিয়া পিতামাতার সম্পূর্ণ ভাবনা। অপ্রাপ্তবয়স্ক, অসমর্থ, ও রোগগ্রস্ত পুত্রের বিবাহ না দিলে পিতা-মাতার ক্ষতি কি? পুত্র যখন উপযুক্ত অর্থাৎ উপার্জ্জনশীল হইবে, আপনাকে ও অন্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, যখন বুঝিবে দুই দিক হইতে দুইটি নদী আসিয়া একস্থানে সঙ্গত হইলে যেমন

প্রবল বেগের বৃদ্ধি হয় ও তাহারা মিলিত হইয়া শীঘ্র সমুদ্রে যাইয়া পতিত হয়, তাদৃশ স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ বা বিবাহ ধর্ম্মসাধন-সমুদ্রে যাইবার প্রধান উপায়, তখন তাহার বিবাহ দিও। যখন দেখিবে যে—পুত্র বুঝিয়াছে যে, তাহার পুরুষ-প্রকৃতি এবং স্ত্রীর কোমল প্রকৃতি সম্মিলিত হইলে দুশ্চর কঠোর কার্য্য পর্য্যন্ত সুগম ও সরল হইয়া আসিবে, যখন দেখিবে পুরুষের বীরভাব, উৎসাহ, উদ্যম ও সাহস এবং স্ত্রীর ভক্তি, লজ্জা, দয়া, মমতা, স্নেহ আদি মিলিত হইলে এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে, তখনই পুত্রের বিবাহ দিও। কিন্তু তাহা না করিয়া দায়গ্রস্তের ন্যায়, পুত্রের পরম শত্রুর ন্যায়, কেন তাড়াতাড়ি তাহার দুর্ব্বল ও শীর্ণ কণ্ঠে একখানি জগদ্দল পাথর ঝুলাইয়া দাও? যে আপনার ভার বহনে অসমর্থ, তাহার উপরে এ বিষম ভার অর্পণ করা দয়ালু পিতামাতার, পুত্র-বৎসল পিতামাতার, শুভার্থী পিতামাতার কি কর্ত্তব্য?

যখন দেখিতে পাই—ভাবনায় চিন্তায় অজাতশ্মশ্রু বালকের নেত্র কোটর-প্রবিষ্ট, মুখখানি অত্যন্ত মলিন, শ্রীহীন ও বিশুষ্ক, আহারাভাবে—যথোচিত ভোজ্য দ্রব্যের অভাবে—শরীর শীর্ণ, সৌষ্ঠব-শূন্য ও অল্প বয়সেই বার্দ্ধক্য-চিহ্ন-যুক্ত. শত শত উমেদার আফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে, বড় বড় কর্ম্মচারীদিগের, বড় বড় বাবুদিগের বাসায় বাসায় বেড়াইতেছে, কাতর ভাবে তোষামোদ করিতেছে, বিপদগ্রস্তের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছে, একখানি সুপারিসপত্র পাইলে আনন্দে নৃত্য

করিতেছে, হায়! তখন হৃদয় ফাটিয়া যায়! বঙ্গীয় অবিবেকী পিতামাতাকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্তি হয়! বর্ত্তমান দেশাচারের প্রতি এবং লৌকিক ব্যবহারের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হয়! মন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া থাকে! সভ্য সমাজ! একবার তাকাইয়া দেখ, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, উহারা পিতামাতার দুর্ব্ব্যবহারের ফল ভোগ করিতেছে, উহারা পিতামাতার (সাধের কার্য্য) অসময়োচিত বিবাহের ফল ভোগ করিতেছে। সংসার মহাভার হইয়া তাহার মস্তকে চাপিয়া পড়িয়াছে। যদি বালক-কালে তাহাদের পিতামাতার ছোট ছেলের "খুর-খুরে" রাঙ্গা বউটী দেখিতে ইচ্ছা না হইত, তাহা হইলে কি তাহাদিগের শরীরে মুখে ও কার্য্যে স্ফূর্ত্তির অভাব থাকিত? তাহা হইলে কি তাহাদের মন এত ক্ষুদ্র ও নীচাশয় হইত? তাহা হইলে কি তাহাদের চিত্ত পরের গোলামী পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইত? হায়! বঙ্গদেশ নিজ দুর্ব্বুদ্ধিদোষে ডুবিতে বসিয়াছে, অনুচিত ও অসময়োচিত বিবাহ বাঙ্গালাদেশকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়াছে। যাহারা স্বয়ং অকৃতী ও পরিবার-প্রতিপালনে অসমর্থ, যাহারা অবিচলিতচিত্তে সংসারের কোলাহল ও সংসারের বিড়ম্বনা সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম—যাহারা পবিত্রভাবে স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইতে শিক্ষা করে নাই,—যাহারা স্ত্রীকে বিলাস-সামগ্রীর পরিবর্ত্তে সহধর্ম্মিণী বলিয়া হৃদয়ের সহিত পবিত্র প্রণয় করিতে অবগত নহে, তাহাদিগের বিবাহকে, এবং পুত্র তাদৃশ না হইলে বিবাহ দেওয়াকে আমরা অনুচিত, নীতি-বর্জ্জিত, অতি নিন্দিত ও আর্য্যশাস্ত্র-বিগর্হিত

বিবাহ বলি। এই অনুচিত বিবাহ ক্রমে ক্রমে ভাবী বংশধরদিগকে দারিদ্র্য-দুঃখ-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিবে, পবিত্র আর্য্য-সমাজকে পাপ-ভারাক্রান্ত করিবে এবং ঈশ্বরের পবিত্র প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পৃথিবীকে নরক করিয়া তুলিবে। বালক প্রত্যহই বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়, এই অধ্যয়নের ফল তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে কি দৃষ্ট হইবে তাহা কে জানে? ধীবর জাল নিক্ষেপ করিল, জালে মৎস্য, সর্প কি জঞ্জাল উঠিবে তাহা কে স্থির করিয়া পূর্ব্বে বলিতে পারে? পুত্র তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইতে না হইতেই বিবাহের জন্য পিতা বড়ই ব্যস্ত! যাহাতে বিবাহটী ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়, যাহাতে লোকে বিবাহকালীন বাদ্য, গীত, আলোক-মালাদির সুখ্যাতি করে, সেজন্য বড়ই চিন্তা! আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত, ঘটকাদি সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত! বিবাহ হইয়া গেল, সপ্তাহ কাল জাঁক জমকে কাটিয়া গেল, লোক জন খাইয়া, পরিয়া, বিদায় লইয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই গা ঢাকা দিল, বিবাহিত বালক সহজেই চিত্তবিনোদপ্রিয় হইয়া উঠিল। লেখা পড়ায় শিথিলতা এবং আমোদ প্রমোদে তাহার আসক্তি বৃদ্ধি হইল। এদিকে সময়ের প্রভাবে নবীনা ঠাকুরাণীর প্রতি মা ষষ্ঠীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়িল। বরকন্যার কৈশোর অবস্থা অতীত হইতে না হইতেই অপুষ্টাঙ্গ সন্তান উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। কয়েক বর্ষ মধ্যে অপূর্ণ বয়সে তাঁহারা গৃহস্থ হইল। নিজের উদর পূর্ণ করিবার উপায় হয় নাই, এখনও অর্থ উপার্জ্জনে সামর্থ্য হয় নাই, আয়ের নাম গন্ধ নাই, কিন্তু ব্যয়ের

সম্পূর্ণ আবশ্যক ; দাস দাসী রাখিবার সামর্থ্য নাই, দুগ্ধ মিষ্টান্ন কিনিবার পয়সা নাই, ঘরের পঙ্গুপাল "মা খাব" "বাবা খাব" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলে কি দেয় তাহার সম্বল নাই ; বস্ত্রাভাবে, ভূষণাভাবে রক্ষণাভাবে বালকগণ নগ্নবেশে অঙ্গে ধূলি মাখিয়া রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া বঙ্গ-সমাজের বীভৎস মলিন মূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছে।

বঙ্গ সমাজ, এরূপ বিবাহ দ্বারা দেশের দীন দশা আর বাড়াইও না ! এরূপ বিবাহ দ্বারা সমাজের দুর্ব্বলতা নীচাশয়তা ও হীনতার বৃদ্ধি করিও না। বঙ্গবাসী বালকগণ, তোমরা সুযোগ্য হও, ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা কর, দারিদ্র্যদুঃখের পথ রোধ কর, আপনাদিগকে সমাজের ভূষণ কর, প্রকৃতির উন্নতি সাধন কর। তৎপরে কল্যাণের জন্য, দেশের হিতের জন্য, পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য সুলক্ষণাক্রান্ত কন্যা বিবাহ করিও।

শ্রীকাশীযোগেশ্বরী-যোগেশ্বরনাথৌ বিজয়েতে।

কাশী-যোগাশ্রম।

২১এ আষাঢ়, ১৮১৩।

সচ্চিদানন্দনিকেতনেষু—

তোমার দুইখানি পত্রই পাইয়াছি। অত্যন্ত অবকাশাভাব-প্রযুক্ত পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। তোমার অভিভাবকগণ বড় তাড়াতাড়ি তোমার বিবাহ দিতেছেন। একটু কর্ম্মক্ষম—উপার্জ্জনক্ষম হইলে বিবাহ দিলেই হইত। আজকাল যে সময় ও সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে বিশেষ অর্থ সামর্থ্য ব্যতীত গৃহস্থের সুখী হইবার উপায় দেখি না। বিবাহের প্রথমে আমোদ আছে, কিন্তু অর্থহীন হইলে পরিণামে বড় বিপদ্। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা প্রথমে করিয়া তৎপরে বিবাহের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। এই ব্যবস্থা না হওয়া প্রযুক্ত কত গৃহস্থ যে অতি কষ্ট পায়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অনেক সময় দুঃখিত হই। বিবাহ করা ধর্ম্মের অনুকূল, তজ্জন্য বিবাহ-বিরোধী হইও না। ধর্ম্মপত্নী সহধর্ম্মিণী সহ আশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ভগবান্ তোমার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করুন। তোমার মাতাঠাকুরাণীকে মা অন্নপূর্ণার কৃপাশীর্ব্বাদ জানাইবে।

শুভার্থী

(স্বাক্ষর) শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

পরম ভক্ত ধনা।
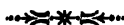
পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় কস্যচিৎ জাঠ-জাতীয়ের গৃহে ধন্যজন্মা ধনা জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা পিতা কৃষি-ব্যবসায়ী ছিলেন! অকৃত-বিত্ত কৃষিজীবী হইয়াও তিনি সাধু মহাত্মগণকে শুশ্রূষা করিতেন বলিয়া পরিব্রাজক শান্ত সাধুগণ সময়ে সময়ে তাঁহার গৃহে আসিয়া সেবা গ্রহণ করিতেন। ধনা যখন চপলমতি শিশু, সেই সময়ে অভ্যাগত জনৈক ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে স্বয়ং স্নান পূর্ব্বক নিজনিকটস্থ শালগ্রাম-শিলার স্নান করাইয়া ভক্তিসহ সচন্দন তুলসীদলদ্বারা পূজা ও তাঁহাকে প্রথমে নিবেদন করিয়া তৎপরে ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠাযুক্ত ভাবভঙ্গী দেখিয়া শিশু-শিরোমণি ধনারও ঐরূপ করিতে মনে মনে বড় সাধ হইল। ধনাজী ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আমাকেও তোমার মত একটী দেবমূর্ত্তি দাও, আমিও তোমার মত পূজার্চ্চনা করিব।" ব্রাহ্মণ ক্রীড়াসক্ত বালকের কথায় অনেকক্ষণ উপেক্ষা ও ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বারংবার বালকের প্রার্থনা ও কাতর বচনানুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবোধ বালককে ক্ষান্ত করিবার জন্য একখানি কৃষ্ণবর্ণের শিলাখণ্ড দান করিলেন ও বলিলেন "বৎস! তুমি এই দেবতার পূজা করিও।" পূজার দেবতা পাইয়া ধনার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। দেবতাকে কখন বক্ষে, কখন

মস্তকে রাখিয়া কতই আদর করিতে লাগিলেন। বাল-ভক্ত ধনার বড় পূজার ঘটা লাগিয়া গেল। ধনা সকল কর্ম্ম ও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া নিত্য প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে অভীষ্ট দেবতাকে স্নান করাইয়া পুষ্করিণী হইতে মৃত্তিকা লইয়া ললাটে তিলক করিতে লাগিলেন। তুলসীদলের পরিবর্ত্তে যে কোন বৃক্ষেরই হউক না কেন; হরিত পত্র দ্বারা দেবতার পূজা ও অত্যন্ত প্রেম উল্লাসের সহিত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। যখন ভক্তকুল-কেশরী ধনার মাতা ধনার খাইবার জন্য রুটী আনিয়া দিতেন, ধনা তখন সেই রুটী দেবতার সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নেত্র উন্মীলন করিয়া যখন দেখিতেন যে, ইষ্টদেব তখনও নিজভাগ গ্রহণ করেন নাই, তখন তিনি চক্ষু পুনর্মুদ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। পরিশেষে যখন দেখিতেন, ভগবান্ তাহার রুটী খাইলেন না, তখন নিতান্ত দুঃখিত ও উদাস চিত্তে বারংবার করযোড়ে নিবেদনপূর্ব্বক অনেক বালোচিত অনুযোগ, অনুরোধ ও প্রার্থনা করিতেন। তাহাতেও যখন দেখিতেন, ভগবান্ কিছুতেই ভোজন করিলেন না, তখন সমস্ত রুটী পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিতেন ও আপনিও উপবাসী থাকিতেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ায় অনাহারে ভগবৎ-প্রাণ ধনাজী নিতান্ত শুষ্ক ও মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। আমার প্রদত্ত খাদ্য ঠাকুর খাইলেন না, এই খেদে মর্ম্মাহত ধনার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। হৃদয়ের ঠাকুর ভক্তবৎসল ভগবান্ সরল-বিশ্বাসী অনন্যচিত্ত ধনার দুঃখাবেগ

নিবারণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারেন! "অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ম্" চিন্ময় যোগসমাধিগম্য নারায়ণ ধনার মনের আকর্ষণে অপূর্ব্ব বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ধনার নিবেদিত রুটী ভোজন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ভোজন হইয়া গেলে, মহাভাগ বালকেশরী ধনা বলিলেন, "তুমি সব রুটীই খাইয়া ফেলিলে তবে আমি খাইব কি? আমাকে কি একটুও দিবে না?" ভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া ধনাকে অবশিষ্ট রুটী দান করিলেন। আজ ধনার রুটী দেবদুর্লভ অমৃত হইতেও মধুর হইয়া উঠিল। ভক্ত-হৃদয়-বল্লভ প্রত্যহ এইরূপে ধনাকে নিজ মনোহর রূপমাধুরীতে মোহিত করিতে লাগিলেন। সেই ভুবনমোহন রূপ একবার দর্শন করিলে কি আর জীব সংসারে স্থির থাকিতে পারে! ধনা ক্ষণকালের জন্য যদি সেই রূপ নয়নে বা অন্তঃকরণে না দেখিতে পাইতেন, তবে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতের ন্যায় ধরাশায়ী হইয়া পড়িতেন। ভক্তি-ডোরে ধনা ভগবান্‌কে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভক্তের ধন ভগবান্‌ও ধনাকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, "আমি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গেই থাকিব ও তোমার শ্রম-লাঘবার্থে গোপ-গৃহ হইতে তোমার গাভী দোহন করিয়া আনিয়া দিব।" ভক্তের ভব-কষ্ট-বিনাশকারী সুরাসুর-সেব্য ভগবান্ আজ বাল-ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ধনা সর্ব্বদা ভগবান্‌কে নিকটে পাইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে সেই ব্রাহ্মণ ধনাজীর গৃহে পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ধনাকে নিজ দত্ত শালগ্রাম-শিলার পূজার্চ্চনা

করিতে না দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ধনা বলিলেন "আপনি আমাকে ভাল ঠাকুর দিয়া গিয়াছিলেন! সে ঠাকুর আমাকে কত দিন খাইতে দেয় নাই। অনেক কষ্টের পর এক্ষণে এমন হইয়াছে যে, গাই পর্য্যন্ত দুহিয়া আনে।" ব্রাহ্মণ তচ্ছ্রবণে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "কৈ তোমার ঠাকুর কোথায়? আমাকেও দেখাও দেখি।" ধনা বলিলেন, "ঐ দেখ না, দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; বলিলেন, "কৈ ধনা! আমি তো দেখিতে পাইতেছি না" ধনা বলিলেন, "ঠাকুর! এই ব্রাহ্মণই তো তোমাকে দিয়া গিয়াছিলেন, ইঁহাকে দর্শন দাও। তুমি আমাকেও এইরূপ প্রথম প্রথম দেখা দাও নাই, ব্রাহ্মণকে দেখা দাও প্রভো!" ঠাকুর ভক্তের প্রেমমাখা বাক্যে—ভক্তের অনুরাগপূর্ণ অনুরোধে—বলিলেন, "ধনা! তুমি তোমার জন্ম জন্মান্তরের সাধনের ফলে—ভক্তির বলে—আমার দর্শন পাইয়াছ, উহার তো সে তপোবল নাই, তবে তোমার গুরু হইয়া উহার বহু পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পুণ্যবলে আমার দর্শন পাইবে।" তুমি উহার ক্রোড়ে উপবেশন কর, তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শে উহার দিব্য চক্ষু হইবে ও তাহা হইলেই সে আমার দর্শন পাইবে। ধনা তাহাই করিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্তবৎসল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য ও পবিত্র হইলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! তুমি চিরদিনই বালকের সখা, গোপালবেশে রহিলে, গো-দোহন কার্য্য এখনও বিস্মৃত হও নাই! দীনবন্ধো! শেষ দিনেও যেন এই মোহনমূর্ত্তি দেখিতে পাই।"

অতঃপর লোকমর্য্যাদা রক্ষণার্থ ভগবান্ ধনাজীকে গুরুর নিকট

দীক্ষিত হইতে উপদেশ দিলেন। ভগবৎ-কৃপাপাত্র ধনা তাঁহার আজ্ঞানুসারে পবিত্র তীর্থ বারাণসীক্ষেত্রে আসিলেন, ও রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাধু সজ্জনের সেবায় সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিলেন। ধনা এক্ষণে গুরুর কৃপায় ভগবানের গূঢ় মর্য্যাদা বুঝিলেন, ও অন্তরের ধনকে অন্তরে দর্শন করিবার শিক্ষা করিলেন।

ধনার পিতামাতা একদিন ধনাজীকে গোধূম বপন করিবার জন্য ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি সাধু আসিয়া ধনাজীর নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। ধনাজীর নিকট তখন ভূমিতে বপন করিবার উপযুক্ত বীজ (গোধূম) ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সাধুগণকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া অগত্যা সেই গোধূমগুলি দান করিয়া পিতা মাতার ভয়ে, বীজ উপ্ত হইলে ক্ষেত্র যেরূপ অবস্থায় রাখিতে হয়, ভূমি সেইরূপ করিয়া রাখিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ধনার ভীতি-ভঞ্জনের জন্য নিজ মায়ায় সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিলেন। লোকে ধনার ক্ষেত্রের বহুল প্রশংসা করিতে লাগিল। লোকমুখে নিজ ভূমির প্রশংসা শুনিয়া ধনাজী ভাবিলেন, আমি তো বীজ বপন করি নাই, বোধ হয় লোকে আমাকে পরিহাস করিতেছে। কিন্তু যখন স্বয়ং গিয়া দেখিলেন ভূমি সত্য সত্যই শস্যে পরিপূর্ণ, তখন ভগবানের আশ্চর্য্য কৃপাদৃষ্টি স্মরণ করিয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল ও সেই দিন হইতে তিনি আরও অধিক রূপে ভগবানের ও সাধুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে

অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইন্দ্র! তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি আদৌ নাই, তুমি বজ্র নির্ম্মাণের নিমিত্ত বৃথা কেন পরম সাধু দধীচি মুনিকে দুঃখ দান করিলে? এই অভাগার "মন" কেন উঠাইয়া লইয়া গেলে না? এই পাষাণ-মনের দ্বারা কঠোর হইতেও কঠোরতর বজ্র নির্ম্মিত হইত। যাহার মন ভগবানের অগণ্য কৃপার চিহ্ন দর্শনেও ভক্তি-বিগলিত হয় না, তাহার মন—বজ্র হইতেও কঠিন।"

ইন্দুরেখা।

—:*:—

পশ্চিমোত্তর প্রদেশের জনৈক ভূস্বামীর কুল উজ্জ্বল করিয়া ইন্দুরেখা জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দুর রূপে গৃহের শোভা যেন আরও বাড়িল। ইন্দুকে দেখিবার জন্য, ইন্দুকে ক্রোড়ে করিবার জন্য, ইন্দুকে কাছে বসাইয়া আদর করিবার জন্য, পাড়ার লোক, দেশের লোক, ছুটিয়া আসিত। ইন্দুর হাসি, ইন্দুর দৃষ্টি যেন স্বর্গীয় তেজের সঞ্চার করিত; ইন্দুর অন্তঃকরণে যেন কি এক সুধাময় সুধাকর অস্ফুটভাবে ঢাকা রহিয়াছিল। ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন সেই পূর্ণেন্দুর দিব্য মৃদু কিরণ রাশি ফুটিয়া বাহির হইত। বালিকা ইন্দুরেখা ইন্দুকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুর অন্তঃকরণের সাধু বৃত্তিসমূহও ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ইন্দু যে সকল বালিকার সঙ্গে খেলা ধূলা করিতেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত। ইন্দুর কাছে না

আসিলে তাহাদের প্রাণ মন যেন ব্যাকুল হইত। ইন্দুর ধীরতা, ইন্দুর মৃদুমধুর ভাব, ইন্দুর স্নেহমাখা কথা বার্ত্তায় সকলেই ইন্দুকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। প্রীতি মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন ইন্দুরেখা-রূপে ধরাতলে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

ইন্দুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃগৃহে একটী সাধু অভ্যাগত আসেন। ইন্দু তাঁহাকে নানা উপচারে শালগ্রামশিলা পূজা করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, আমিও এইরূপে ঠাকুরের পূজা করিব। মনের ভাব অধিকক্ষণ গোপন করিতে না পারিয়া ইন্দু সাধুকে অনুনয়সহ নিজ স্বভাবসিদ্ধ মৃদুমধুর ভাষায় বলিলেন, আমাকে আপনি একটী ঠাকুর দিন, আমিও আপনার মত ঠাকুরকে নাওয়াইব, খাওয়াইব, শোয়াইব, আর আমি যখন একাকী থাকিব, তখন মনের সাধে কত আদর করিব! বালিকার বাক্যে সাধু উপহাস করিয়া উঠিলেন। তাহাতে ইন্দুর মর্ম্মে বেদনা বোধ হইল, ইন্দুর দুইটী চক্ষু দিয়াই টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সাধু তাহা দেখিয়া পুষ্প মিষ্টান্ন আদি দিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা করিতে চাহিলেন; কিন্তু ইন্দু তাহাতে ভুলিলেন না। ইন্দু ঠাকুর ভিন্ন আর কিছু চাহেন না। সাধু কি করেন, অবোধ (?) বালিকাকে না ভুলাইলেও নয়; কোথা হইতে খুঁজিয়া একখানি কাল পাথর আনিয়া বলিলেন, ইন্দু! এই ঠাকুর লও, ইহাকে তুমি ভাল করিয়া পূজা করিও, ইহার নাম 'শিল্ললী'। ইন্দুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে মুখের হাসি বাহির হইল, শরতের মেঘে বৃষ্টি হইতে হইতে যেন উজ্জ্বল চন্দ্রমা ফুটিয়া আকাশ আলো করিয়া ফেলিল। শিল্ললী ইন্দুর হৃদয়ের ধন হইল; খেলা

ধূলায় আর ইন্দুর মন রহিল না। একটী বড় কৌটার মধ্যে রঙ্গীণ কাপড় বিছাইয়া ইন্দু শিল্পলীকে বসাইলেন; আপনি সুগন্ধ পুষ্প চয়ন করিয়া শিল্পলীকে সাজাইলেন। চন্দন-চর্চ্চিত তুলসীদল শিল্পলীর মস্তকে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দুর মনে যাহা আসিতে লাগিল, তিনি নিজের শৈশভ-সুলভ মধুর ভাষায় তাহাই বলিয়া ঠাকুরের পূজা পাঠ করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা প্রতিবাসিবর্গ সকলে আমোদ করিয়া ইন্দুর পূজা দেখিতে আসিতেন ও ইন্দুর পূজার উপকরণ, ব্যবস্থা ও ভাব দেখিয়া হাস্য করিতেন, কিন্তু ইন্দু কাহারও দিকে না তাকাইয়া তদ্গত চিত্তে নিজে মন্ত্র পড়িয়া যখন পূজা ও স্তুতি করিতেন, তখন ইন্দুর নয়ন-জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত। পূজাকালে ইন্দুর মুখপ্রভা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

দেখিতে দেখিতে ইন্দুরেখার বিবাহের বয়স হইল। ইন্দুর বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই, ইন্দু আর কাহাকেও ভাল বাসিতে—আপনার ভাবিতে—চাহেন না। পিতামাতা তাহা মানিবেন কেন, একটী যোগ্য বর দেখিয়া ইন্দুর নিতান্ত অনিচ্ছাতেও ইন্দুর বিবাহ দিলেন। বাদ্যোদ্যম ধূমধামে সকলে আনন্দিত, কিন্তু ইন্দুরেখা যখন শুনিলেন "তাঁহার বর হরিবিমুখ নাস্তিক" তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। পিতা মাতার অধীনতা বশতঃ মর্ম্ম-মৃত হইয়াও বিবাহ করিতে হইল। ইন্দুকে নানাভরণে সাজাইয়া গুছাইয়া পিতা যখন শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন, তখন ইন্দুর অত্যন্ত ভাবনা হইল। ভাবিলেন হরিবিমুখ পুরুষের নিকট তিনি কিরূপে বাস করিবেন! মনের দুঃখে তিনি সঙ্গে কোন দাস দাসী লইলেন না, কেবল শিল্পলী ঠাকুরকে কৌটা মধ্যে নিজ শিবিকায় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহাকেই সহায় করিয়া তাঁহারই ভরসায় কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন। অনেক দূর গিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য বাহকগণ একটী নদীতীরে শিবিকা রাখিল। এই অবকাশে ইন্দুর স্বামী দিব্য-রূপলাবণ্যবতী নবীনা ভার্য্যার মুখ খানি ভাল করিয়া দেখিবে,তাহার সহিত দু'টী একটী মিষ্ট আলাপ করিবে,এই আশায় ইন্দুর নিকট আসিল। ইন্দু স্বামীকে হরিপরাঙ্মুখ পুরুষ জানিয়া তাহার মুখাবলোকন করিলেন না। স্বামী বারংবার অনুনয় করিয়াও ইন্দুর মন পাইল না। অনেকক্ষণ পরে ইন্দু বলিলেন, যদি তুমি আমাকে চাও, তবে ভক্তিপরায়ণ হইয়া হরিপদারবিন্দ সেবা কর! আমি হরিপরাঙ্মুখ পুরুষকে ভাল বাসি না। নাস্তিক স্বামী ইন্দুর এই বাক্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া ইন্দুর নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক শিল্পলীর কৌটা কাড়িয়া লইল, ও নদী স্রোতের জলে ফেলিয়া দিল। এই মর্ম্মবিদারক ঘটনা দেখিয়া ইন্দুরেখা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বামী অনেক চেষ্টা করিয়াও অনেক প্রবোধ-বাক্যেও তাঁহার রোদন বন্ধ করিতে পারিল না। ইন্দুর এই রোদনাবস্থাতেই বাহকগণ শিবিকাসহ তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে আনিয়া পৌছাইয়া দিল।

ইন্দুর রোদন আর নিবৃত্ত হয় না। অনেকে ভাবিল, মেয়ে প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে যেরূপ কাঁদিয়া থাকে, ইন্দু সেইরূপ কাঁদিতেছে। ইন্দুর মর্ম্মবেদনা লোকে কিরূপে বুঝিবে? সংসারের সমস্ত বিনষ্ট হইলেও, জগতের সকল সুখে বঞ্চিত হইলেও, ইন্দু যাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারেন, আজ বিবাহিত পতি মরিয়া গেলেও যে জগৎপতি মাধবের সেবাতৎপর থাকিলে ইন্দুকে বৈধব্য

যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, ইন্দু আজ সেই সাধের হৃদয়নিধি শিল্পলীদর্শনে ও সেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন। কে যেন ইন্দুর মর্ম্মতন্ত্র ছিঁড়িয়া দিয়াছে, যেন ইন্দুর নয়নতারায় উত্তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ হইয়াছে। ভক্তের প্রাণে মনোমোহন দেবতার অদর্শনে যে বিরহ-যাতনা হয়, তাহা কি ইন্দুর বিবাহিত স্বামী অথবা শ্বাশুড়ী ননন্দাদির প্রবোধ-বাক্যে বিদূরিত হইতে পারে! ইন্দুর আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, দিবারাত্রি দর বিগলিত ধারায় দিব্য লাবণ্যময় গণ্ড ও বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সোণার চাঁদ-মুখ খানি মলিন হইয়া পড়িল। যখন সকলে বুঝিল যে, ইন্দুরেখার শিল্পলীকে না পাইলে জীবন-সংশয়, তখন সকলে ইন্দুকে সঙ্গে করিয়া নদীতীরে গমন করিল। ইন্দুর স্বামী বলিল, সে শিল্পলী কোথায় ভাসিয়া বা ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া এখন অসম্ভব। হা অবিশ্বাসী! ইন্দুর হৃদয়-মণি কি সামান্য নদীনীরে ডুবিবার সামগ্রী? যদি উহা কখন ডোবে, তবে, ইন্দুর ন্যায় সরল হৃদয়ের ভক্তি-ভাবের নদীতেই ডুবিয়া থাকে, উহা অন্যত্র ডুবিবার নহে। যদি ভাসিতে হয়, তবে ইন্দুর ন্যায় ভক্তের নয়ননীর-প্রবাহেই তিনি ভাসিয়া থাকেন, নদীর জলে ভাসিয়া যাইবার সামগ্রী তিনি নহেন। ইন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে নদীতীরে দাঁড়াইয়া করযোড়ে শিল্পলীদেবকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কৃপাসিন্ধু! কোন্ অপরাধে এ দুঃখিনী দাসীকে ত্যাগ করিলে! প্রভো! আমার যে তুমি বই আর কেহই "আমার" বলিবার নাই; বিপদে আপদে সঙ্কটে তুমিই এ দাসীর একমাত্র ভরসা! তুমি যদি চলিয়া গেলে, তবে এ দাসীকে কেন রাখিয়া গেলে! নাথ!

আজ সামান্য নদীতে যদি তোমাকে হারাই, তবে ভবসিন্ধুতে বিষম তুফান উঠিলে কাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহা পার হইব! শুনিয়াছি তুমি কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব, তবে বল দেখি এ কাঙ্গালিনী তোমায় ছাড়িয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? প্রভো! দেখা দাও, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যদি গভীর জলে স্নান করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমায় কেন বলিলে না, আমার প্রেমের অগাধ জলে তোমাকে নাওয়াইতাম। নাথ! কোথায় আছ, দেখা দিয়া দুঃখিনীর প্রাণ জুড়াও। ভক্তের প্রেমের নিধি, ভক্ত কাঁদিলে কি তিনি দর্শন না দিয়া থাকিতে পারেন! লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে! বুদ্ধিতে ধারণা হয় না, অকস্মাৎ সম্মুখস্থ জলরাশি ভেদ করিয়া ইন্দুর সাধের শিলাী কৌটাসহ ভাসিয়া উঠিলেন, ইন্দুরেখা অমনি উঠাইয়া লইলেন, বক্ষে ও মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। মনের সমস্ত কষ্ট বিনষ্ট হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া নাস্তিক পতির মন টলিল, ভক্তি-বিশ্বাসের মহিমা বুঝিল, হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট চিরদিনের অপরাধ স্বীকার করিয়া ভক্তিভাব ভিক্ষা করিতে লাগিল। শ্বাশুড়ী ননন্দাদি ভক্তিরসে আর্দ্র হইল। একা ভক্তিমতী ইন্দুরেখার গুণে মরুভূমে বাণ ডাকিয়া গেল, শুষ্কতরু মঞ্জরিত হইল। ধন্য ইন্দুরেখা! আজ তোমার গুণে পাষণ্ড পতি ও শ্বশুর-কুল উদ্ধার হইল। আজ হইতে ইন্দু-রেখার শ্বশুরালয় ভগবানের উৎসব-গৃহ হইল। এইরূপ কুলবধূর গুণেই শ্বশুরকুল পবিত্র হয়।